।ফি।চা।র।

কিংবদন্তির শোলে
রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা এবং প্রেমের অজানা গল্প

অনুপমা চোপরা
অনুসৃতি : প্রিয় রায়হান

†kv‡ji Pvi Awf‡bZv : AwgZvf e"Pb, a‡g›`, mÄxe Kgvi I AvgRv` Lvb

[ইন্ডিয়া টুডের বিশেষ প্রতিনিধি অনুপমা চোপরা সিনেমা নিয়ে বিচিত্র লেখালেখি করেন। পেঙ্গুইন বুকসের প্রকাশিত তার 'শোলে : দ্য মেকিং অব এ ক্ল্যাসিক' বইটির অনুবাদ এখানে পত্রস্থ হলো। ভারতীয় ছবি শোলে ইতিহাস সৃষ্টি করে চিরায়ত চলচ্চিত্র হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু এই ছবি নির্মাণের নেপথ্যে যেসব রোমাঞ্চকর গল্প রয়েছে সেগুলোও একটি আকর্ষণীয় চলচ্চিত্রের উপাদান হতে পারে। মধ্যসত্তরে মুক্তিপ্রাপ্ত শোলে এখনো দর্শককে মোহমুগ্ধ করে রাখে। আর সে জন্যেই ভারতীয় চ্যানেলগুলো বিশেষ কোনো উপলক্ষে অথবা উপলক্ষ ছাড়াই 'শোলে' দেখিয়ে থাকে। কিংবদন্তিতুল্য পাত্র-পাত্রীতে পরিণত হওয়া তারকাদের ব্যক্তিগত জীবনের ও উত্থানের বিচিত্র গল্প উপন্যাসের আঙ্গিকে লিপিবদ্ধ হয়েছে এই বইয়ে।

'শোলে : দ্য ম্যাজিক অব এ ক্লাসিক' বইটির লেখিকা প্রতিটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছিলেন 'শোলে'র একাধিক চরিত্রের সংলাপ ব্যবহার করে। যেমন- কিতনে আদমি থি, জো ডার গেয়া সামঝো মার গেয়া (গাব্বার সিংয়ের সংলাপ), কিমাত জো তুম চাহো, কাম জো ম্যায় চাহু (ঠাকুর সাহেবের সংলাপ), কিংবা ইস্ স্টোরি মে ইমোশন হ্যায়, ড্রামা হ্যায়, ট্রাজিডি হ্যায় (বীরুরূপী ধর্মেন্দ্রর সংলাপ)। 'শোলে' ছবির নেপথ্য কাহিনী বলতে গিয়ে 'শোলের'ই সংলাপ ব্যবহার ভিন্ন মাত্রা পেয়েছিল বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে শিরোনাম হিসেবে ব্যবহৃত সংলাপগুলো মিলে যাওয়ায়। বর্তমান অনুবাদের ক্ষেত্রে হিন্দি সংলাপের অনুসরণে অধ্যায়গুলোর শিরোনাম প্রদানের রীতিটি অনুসরণ করা হয়নি।]

শোলে ম্যাজিকে মন্ত্রমুগ্ধ ভারত

১৯৭৪ সালের কোনো এক শুভ সন্ধ্যার শুভক্ষণ। দরোজা খুলে দিলেন ডলোরেস। তিনি ব্যাঙ্গালোরের বিখ্যাত ভবিষ্যৎবক্তা। দেখলেন তিনজন তার সামনে দাঁড়িয়ে। প্রথমজন খর্বকায় এক ভদ্রলোক, মাথায় চওড়া এক হ্যাট, দেখতে বেশ মজাদার লাগছিল। ইনি পরিচালক। দ্বিতীয় ব্যক্তি শ্মশ্রুমণ্ডিত, বেশ লম্বা গড়নের, মনে হয় সারা দিন গোসল করেননি। ইনি ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে রূপদানকারী ব্যক্তি। তৃতীয়জন চকচকে ত্বকের অধিকারিণী- তিনি ভদ্রলোকের স্ত্রী। ব্যাঙ্গালোরের আশপাশে কোথাও তারা ছবির শুটিং করছিলেন। ডলোরেসের ব্যাপারে তারা বিস্তর শুনেছেন। সেদিন বেশ আগেই শেষ হয় শুটিংয়ের কাজ। তারা তিনজন ঠিক করলেন- বেশ, আজই যাওয়া যাক ডলোরেসের কাছে। যেই ভাবা সেই কাজ। সেটি ছিল ওই অভিনেতার প্রথম ছবি। একদল তারকা নায়কের বিপরীতে তিনি খলনায়ক চরিত্রে অভিনয় করছিলেন। তার ভাষায়- ওই ছবির সাফল্যের সঙ্গে ঝুলে আছে তার ভবিষ্যৎ। আর এ পর্যায়ে ডলোরেস কি ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু বলতে পারেন?

কার্ড ছড়িয়ে বসলেন ডলোরেস- মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে ছন্দময় শব্দমালা। সামনের দিকে ঝুঁকে বসলেন স্ত্রীটি, কান তার খোলা। সংশয়পূর্ণ চিত্ত সত্ত্বেও খলনায়ক এবং পরিচালক বেশ অভিভূত হয়ে গেলেন, তারা মনোযোগ দিয়ে আগ্রহভরে শুনছিলেন ডলোরেসের কথা। খলনায়কের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ডলোরেস বললেন, এই ব্যক্তি সঠিকপথে শীর্ষচূড়ায় যাচ্ছেন। নাটকীয় ভঙ্গিতে দম নিয়ে বললেন, এই ছবিটি অনেক বছর ধরে চলবে। নায়ক ও পরিচালক স্মিত হেসে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন, কিন্তু তার পরও কেমন যেন সংশয় রয়েই গেল।

'শোলে' চলেছে পাঁচ বছর- যা পাল্টে দিয়েছে ভারতীয় চলচ্চিত্রের গতিধারাকে। কিংবদন্তির নায়কে পরিণত হন আমজাদ খান- ভারতীয় চলচ্চিত্রে চলমান বিজ্ঞাপনের আইকন বনে যান গাব্বার সিং, সেই ব্যতিক্রমী কণ্ঠস্বর- যেন খলনায়কের আরেক চিত্ররূপ।

এমনকি ডলোরেসও কল্পনা করতে পারেননি শোলের সাফল্য এতোদূর বিস্তার লাভ করবে। শোলে পাল্টে দিয়েছে ভারতীয় চলচ্চিত্রের দৃশ্যপট। ২৫-৩০ বছর পর আজও শোলে পর্দা কাঁপানো ছবি- দর্শক এবং চলচ্চিত্র নির্মাতারা এখনো বেশ গুরুত্বের সঙ্গে দেখেন শোলে- আজও বক্স অফিস হিট করে শোলে। জি সিনেমা, স্টারপ্লাস মাঝে মাঝে তাদের দর্শকদের জন্যে প্রচার করে ছবিটি।

বছরের পর বছর ধরে শোলে এখনো হিট চলচ্চিত্রের শীর্ষ আসন ধরে রেখেছে। আজ এটি শুধু পর্দার ছবিই নয়- এটি শৈল্পিক গুণবিচারে ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ করেছে- এটি এখন কিংবদন্তি। পরিচালক ধর্মেশ দর্শনের মতে, ভারতীয় ঐতিহ্যেরই অংশ হলো শোলে। রাম এবং সীতার মতোই ঘরে ঘরে পরিচিত শোলের চরিত্রগুলো- বীরু, জয়, গাব্বার, ঠাকুর, বাসন্তী বা রাধা। লোককাহিনীর চরিত্রের মতোই হয়েছে

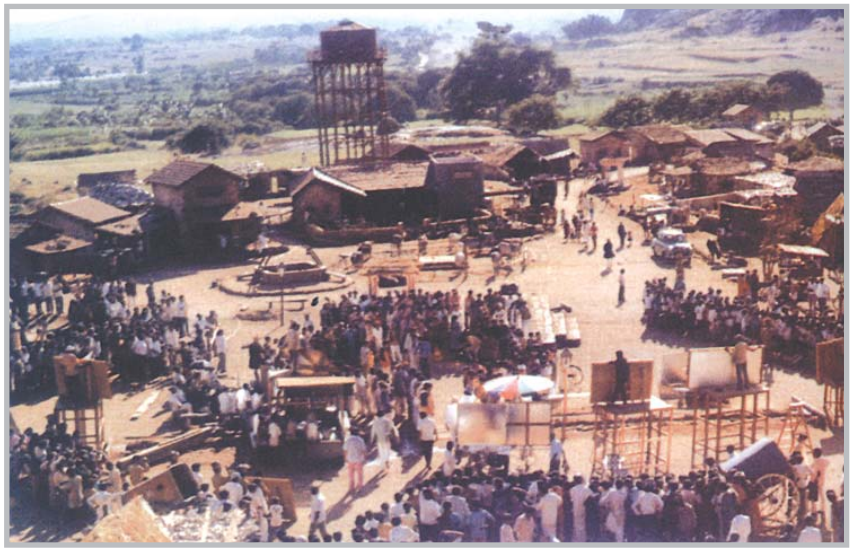

ivgvbMiv‡gi GB ¯'vbwU wQj †kv‡ji gj ïwUs ¯úU

উঠেছে 'শোলে'র কয়েকটি পার্শ্বচরিত্র- সুরমা ভোপালী, জেলার, কালিয়া এবং সাম্বা।

শোলের জনপ্রিয়তা এখনো সেই প্রথম দিনের মতোই। প্রথম মুক্তি পাওয়ার পর এর প্রতি দর্শক আকর্ষণ যেরূপ ছিল- এখনো সেই আগের মতোই আছে। ১৯৯৯ সালে বিবিসি-ইন্ডিয়া পরিচালিত ইন্টারনেট জরিপে 'শোলে' ফিল্ম অব দ্য মিলেনিয়াম নির্বাচিত হয়। এর আবেদন ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী-পেশা বা ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতাকে ছড়িয়ে গেছে বহু আগেই। শোলের গুণকীর্তনে মুম্বাইয়ের একজন বিজ্ঞাপন শীর্ষ কর্মকর্তা যেমন পঞ্চমুখ হবেন, ঠিক একইভাবে একই কথা প্রযোজ্য হায়দ্রাবাদের একজন রিকশাচালকের ব্যাপারেও । শোলের প্রতি এই ভক্তি বা সহানুভূতি অনেকটা অন্ধভাবেই। অনেকেই ছবিটি পঞ্চাশ, ষাট বা সত্তরবার পর্যন্ত দেখেছেন- মুখস্থ হয়ে গেছে এর প্রতিটি ডায়লগ।

'শোলে'কে কেন্দ্র করে পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন ঘটনা-প্রবাহও বলিউডকে বেশ আলোড়িত করে। জয়পুরের এক সাধারণ গৃহবধূ শোলে ছবির বীরুর প্রতি আসক্ত হয়ে স্বামীর নাম পরিবর্তন করে তার প্রিয় নায়কের নামধারণ করতে রাজি করায়। দিল্লির প্লাজা সিনেমা হলের টিকেট ব্ল্যাকার প্রকাশ ভাই টানা ছয় মাস দেড়শ' রুপিতে শোলে ছবির টিকিট বিক্রি করেছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে সে সিলামপুরে একটি ছোট বাড়িও ক্রয় করে। এখানেই শেষ নয়, বাড়ির ভেতর তৈরি করে এক জীবন্ত 'শোলে ঘর'। এর চারদিকে শুধু 'শোলে' ছবির পোস্টার। নিউইয়র্কের এক দৃঢ়চেতা ইমিগ্রেশন অফিসার পর্যন্ত অভিনেতা ম্যাকমোহনকে দেখে হাত তুলে স্বাগত জানান। কারণ তিনি এর আগেই শোলে ছবিতে দেখেছিলেন, এই অভিনেতাই অস্ত্র হাতে পাহাড়ের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। পাটনায় একাধিক অটোরিকশার নামকরণ করা হয় ধান্নু। সিনেমায় হেমা মালিনীর (বাসন্তী) টাঙ্গার নাম ছিল ধান্নু। পাঁচতারা হোটেলের সেরা মদকে অভিহিত করা হয় 'গাব্বার' বলে।

গ্লুকোজ বিস্কুটের প্যাকেট থেকে শুরু করে পানীয়'র বোতল পর্যন্ত- এমন কিছু খুব কম পাওয়া যাবে যা শোলে নামে করা হয়নি। আইওয়া প্রিন্ট অ্যাডভারটাইজমেন্ট, সিরকা মার্চ ২০০০- ভারতীয় ক্রিকেট দলের রান রেটের সঙ্গে তাল রেখে তাদের ইলেকট্রনিক পণ্যের গায়ের দামের সঙ্গে জুড়ে দেয়- 'ভাগ সৌরভ, মেরে পায়সা কা সাওয়াল হায়'। প্রকৃতপক্ষে এটি বাসন্তীর সংলাপ, শোলে ছবিতে যিনি বলেছিলেন, 'ভাগ ধান্নু, বাসন্তী কি ইজ্জাত কা সাওয়াল হায়।' চ্যানেল 'ভি'তে পরিবেশিত গানের মধ্যে রয়েছে 'ইয়ে দোস্তি'। পপ স্টার বালি ব্রহ্ম 'শোলে ২০০০' নামে রিমিক্স করেন, যার সাবটাইটেল ছিল, 'দ্য হাতোদা মিক্স'- এর সঙ্গেও শোলে ছবির সংলাপের মিল রয়েছে। সেখানে বীরুর প্রতি ঠাকুরের উক্তি ছিল- লোহা গারাম হ্যায়, মার দো হাতোদা।

ভারতের চলমান সংস্কৃতির সঙ্গে এভাবে মিশে যাওয়া সম্ভবত 'শোলে ম্যাজিক' ছাড়া অন্য কোনো ছবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সমালোচকরা অবশ্য বলতে পারেন যে 'মাদার ইন্ডিয়া' বা 'মুঘল-ই আজম'-এর চেয়ে ভালো ছবি ছিল; অথবা 'হাম আপকে হায় কৌন' ব্যবসায়িক সাফল্যের দিক দিয়ে শোলের বক্স অফিস রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। কিন্তু শোলের দীর্ঘমেয়াদি অবস্থানের কাছে এ ছবিগুলো কোনো রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতাই গড়তে পারেনি। পরিচালক শেখর কাপুর শোলে সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য। তার মতে, ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়- এর একটি শোলে বিসি (শোলে পূর্ববর্তী) অপরটি শোলে এডি (শোলে পরবর্তী)।

অনিশ্চয়তার সঙ্গে খেলায় অভ্যস্ত সেই একজন

১৯৭৩ সালের এক শীতের রাত । ১০২ ডিগ্রি জ্বরে আক্রান্ত অমিতাভ বচ্চন। প্রচন্ড মাথাব্যথা, গলা শুকিয়ে আসছিল বারবার। তিনি অবস্থান

করছিলেন চিত্রতারকাদের এক পার্টিতে। পার্টির আয়োজক, জিপি সিপ্পি, সে সময় বলিউডের ১নং পরিচালক। অমিতাভ তরুণ অভিনেতা মাত্র। শোলের ঠিক আগে বেশ খানিকটা কেরিয়ার সমস্যায় পড়েন অমিতাভ বচ্চন। তার বেশ কয়েকটি ছবি ফ্লপের পরই বাজারে আসে শোলে। সিপ্পির বাড়িতে সেদিনের সেই পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন রুপালি জগতের সব নামকরা প্রযোজক, পরিচালক থেকে শুরু করে নায়ক-নায়িকা ও পরিবেশকরা। তখনও কেউ জানে না, সিপ্পিরা নতুন কিছু করতে যাচ্ছেন। তাই সবার মুখেই একই কথা- কে হচ্ছেন রমেশ সিপ্পির পরবর্তী নায়ক বা নায়িকা- আর ছবিটিই বা কেমন হবে?

জিপি সিপ্পির ছেলে রমেশ সিপ্পি। যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান। রমেশ তখন তৃতীয় ছবির পরিকল্পনা করছিলেন। এরই মধ্যে তার পর্দা কাঁপানো দু'টি ছবি দর্শক হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। প্রথম ছবি 'আন্দাজ'কে সমালোচকরা মোটামুটি সফল ছবি বলেই মেনে নিয়েছেন। ১৯৭২ সালে হেমা মালিনীকে দিয়ে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করে রমেশ বাজারে ছাড়েন 'সীতা আওর গীতা'। এই ছবিটি বক্স অফিস হিট করার পাশাপাশি রাতারাতি হেমা মালিনীকে নিয়ে যায় বলিউডের শীর্ষ নায়িকার স্থানে। এ রকম আকাশসম সাফল্যের পর সিপ্পিরা ভাবতে থাকেন আরো বড় কিছু করার। ব্যয়বহুল কোনো ছবি, যা থাকবে তারায় তারায় ভরা। তারকাখচিত সম্ভাব্য নতুন ছবি নিয়ে আলোচনা চলছিল বলিউডের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের মুখে মুখে। সবাই ভাবছিলেন, সীতা আওর গীতা-এর সাফল্যের পর সিপ্পিরা ওই ছবির নায়ক-নায়িকা ধর্মেন্দ্র-হেমাকেই কাস্ট করবেন তাদের পরবর্তী ছবিতে। তার পরও সেখানে আরেকটি নায়কের নাম চলে আসছিল- তিনি আর কেউ নন, অমিতাভ বচ্চন। তবে বলিউডের এই তরুণ নায়ককে নিয়ে প্রশ্ন ছিল পরিবেশকদের ভেতর। তাদের মতে, পাতলা লিকলিকে দেহের অমিতাভ দর্শক আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হবেন, আর ক্যারিশম্যাটিক বলে কোনো বৈশিষ্ট্য তারা খুঁজে পাননি অমিতাভের মধ্যে। এর আগেই আরো দশটি ছবিতে ফ্লপ মেরেছেন অমিতাভ। আবার নতুন করে ফ্লপের দরকার নেই। তখনও 'জানজির' মুক্তি পায়নি- যা অমিতাভকে রাতারাতি সুপারস্টারের খ্যাতি এনে দেয়।

প্রায় মধ্যরাতে পার্টিতে এসে উপস্থিত হলেন সেদিনের আলোচিত তারকা। শত্রুঘ্ন সিনহা ঢুকলেন তার চিরায়ত ঢঙেই- হাতে বিশাল আকৃতির এক কেক। 'রামপুর কা লক্ষ্মণ' এবং 'হো তো অ্যায়সা'র মতো বক্স অফিস হিট করা ছবির পর তখন শত্রুঘ্ন সিনহার অবস্থান বলিউডের শীর্ষ তারকাদের ওপরেই। তখন পর্যন্ত অভিনীত ছবিগুলোও শত্রুঘ্ন সিনহা ভিলেনের চরিত্রেই অভিনয় করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত দক্ষ কুশলী এই অভিনেতা নিজের ক্যারিশমায় সেদিন দর্শকপ্রিয়তার সারিতে অনেক নায়ককেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন বেশ খানিকটা পথ। সেদিনের পার্টির মধ্যমণি তাই ছিলেন শত্রুঘ্ন সিনহা- ক্যামেরার

Av¯bvq Av‡qk fw½‡Z Me¨i wms

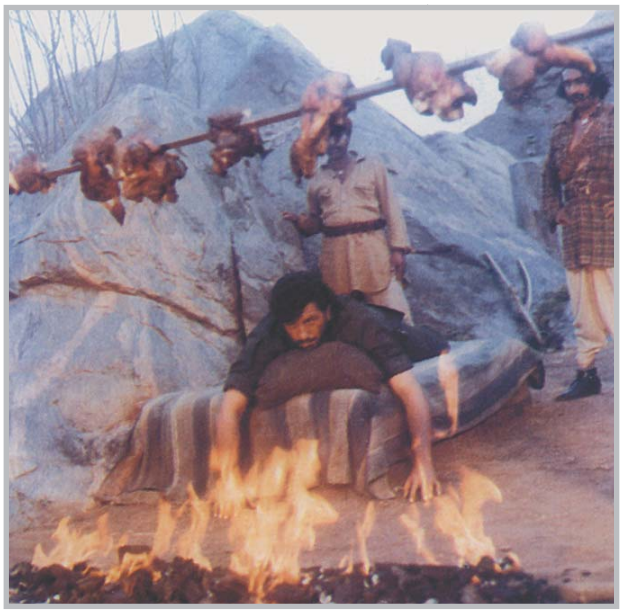

ফ্ল্যাশ বারবার জ্বলে উঠছিল তাকে লক্ষ্য করেই। ধর্মেন্দ্র ও হেমা মালিনীকে নিয়ে কয়েকটা ছবির জন্য পোজ দেন শত্রুঘ্ন, তারপর ধীরলয়ে এগিয়ে যান অমিতাভের দিকে। অভ্যাগত অতিথিরা বেশ উচ্চস্বরেই অভিনন্দিত করেন তারকাদের এই মিলনমেলাকে। কিন্তু ব্যতিক্রম ছিলেন কয়েকজন পরিবেশক, তারা নিচু গলায় রমেশের দিকে ঝুঁকে বললেন, এই লাম্বুজিকে কি আপনি কাস্ট করছেন? ভুলেও এ কাজটি করবেন না। উত্তরে রমেশ তাদের দিকে তাকিয়ে শুধু একটু হেসেছিলেন।

রমেশ সিপ্পির প্রতিভা ও পারদর্শিতা সম্পর্কে ইন্ডাস্ট্রির সবাই তখনও জেনে ওঠেনি। রমেশ সাধারণত কথা বলেন কম, ইন্টারভিউ দেন না বললেই চলে। প্রথম ছবি 'আন্দাজ' যখন মুক্তি পায়- তখন রমেশ ২৫ বছরের যুবক। দ্বিতীয় ছবি 'সীতা আওর গীতা' মুক্তি পায় এর দু'বছর পরই। তখনো বলিউডে শীর্ষ প্রযোজক, পরিবেশক বা পরিচালকরা গোনার মধ্যে আনেননি রমেশকে। তারা ধরে নিয়েছিলেন- ফিল্মো একজন প্রতিষ্ঠিত পিতা তার সন্তানকে পথ চলার সুযোগ করে দিচ্ছেন। অনেকে পিতা-পুত্রের উদ্ভট চিন্তা বলেও বর্ণনা করেছেন রমেশের মুক্তি পাওয়া দুটি ছবি 'আন্দাজ' এবং 'সীতা আওর গীতা' সম্পর্কে। রমেশ বলেন, আমার প্রথম ছবি আন্দাজ একজন বিধবার কাহিনীকে ঘিরে। তখন সবাই মনে করেছিল আমি একজন পাগল। তবে দর্শক আমার ছবি গ্রহণ করেছে। বলিউডের রথী-মহারথীরা প্রথম ছবি আন্দাজকে আমলে না আনলেও 'সীতা আওর গীতা' মুক্তি পাওয়ার পর তারা রমেশকে আর ছোট করে দেখেননি। সবাই অবাক হয়ে যান, শশী কাপুর জিজ্ঞেস করেন, ইয়ে রমেশ সিপ্পি হায় কেয়া চিজ? (এই রমেশ সিপ্পি কী বস্তু?)

তিনি ছিলেন একজন অসম্ভব প্রতিভাবান গল্পকার। বেশ ছোটবেলা থেকেই ছবি করার স্বপ্ন দেখতেন। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়ার সময় মেট্রো সিনেমা হলের সামনে দিয়ে তাকে যেতে হতো প্রতিদিন। মাঝে-মধ্যে তিনি হলের সামনে দাঁড়িয়ে পোস্টারে দন্ডায়মান নায়ক-নায়িকাদের দেখতেন আর কল্পনার জাল বিস্তার করে মেলে ধরতেন অনাগত ভবিষ্যতের দিকে।

রমেশ কলেজজীবন শুরু করেন লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিক্সের মতো খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে। অর্থনীতিতে একটি ডিগ্রি অর্জনের জন্য তিনি সেখানে প্রাণান্ত চেষ্টা করেন। পড়ায় কোনোভাবেই তার মন বসছিল না। রুপালি পর্দার দুর্নিবার আকর্ষণ বারবার তাকে আনমনা করে তুলছিল। সব সময় কানে বাজতো স্টুডিওর হইচই, কোলাহল আর লাইটিং। এক রাতে বাবাকে ফোন করে রমেশ জিজ্ঞেস করলেন, বাবা আমি কি ফিরে আসতে পারি? অন্য কেউ হলে হয়তো কথাটা কানেই নিতেন না। কিন্তু জিপি সিপ্পি ছিলেন একটু অন্য প্রকৃতির, জীবনভর তিনি ঝুঁকি নিয়েই কাজ করেছেন। পুত্রের অনুরোধে কোনো রকম দ্বিধা ছাড়াই জিপি সিপ্পি জবাব দেন, বেশ তো চলে আসো।

মুম্বাই ফিরে রমেশ বোম্বে ইউনিভার্সিটিতে মনোবিজ্ঞানে ভর্তি হন। তবে ডিগ্রি অর্জনের জন্য যেটুকু প্রয়োজন ছিল, তার একচুল বাড়তি পড়াশোনা করতে চাইতেন না তিনি। তার প্রকৃত কাজ হয়ে দাঁড়ায় বিভিন্ন প্রোডাকশন অফিস ও স্টুডিওতে ঘোরাঘুরি। প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৯টায় ক্লাস শেষ করে তিনি ট্রেনে করে চলে যেতেন কারদার স্টুডিও এলাকায়। সেখানেই ছিল সিপ্পি প্রোডাকশন অফিস। দক্ষ পরিচালকদের অধীনে কাজ শিখতে থাকেন রমেশ। গভীর মনোযোগ ও ধৈর্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সব কলাকৌশল একে একে আয়ত্ত করতে থাকেন। দিনের পর দিন খ্যাতিমান পরিচালকের সঙ্গে থেকে কাজ শেখার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসও বাড়তে থাকে। নিজের প্রথম ছবি 'আন্দাজ' শুরু করার আগে পরিচালকদের সহকারী হিসেবে টানা সাত বছর স্টুডিওতে কাজ করেন রমেশ। ১৯৬৯ সালে গুলজারের লেখা চলচ্চিত্র আন্দাজের কাজে হাত দেন রমেশ। আন্দাজের নায়িকা হেমা মালিনী সে সময়ের কথা স্মরণ করে বলেন, তখন প্রায়ই দু'জন নতুন লেখকের কাজ নিয়ে রমেশকে হইচই করতে দেখেছি। এরা কেউই বয়সে তার চেয়ে খুব বেশি বড় নন। এদের একজন সেলিম খান, অন্যজন জাভেদ আখতার।

সেলিমের ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ লেখক প্রতিভা

এবং জাভেদের আত্মবিশ্বাস- দুই মিলিয়ে এক অনন্যসাধারণ সমন্বয় ঘটে। হলিউডের চলচ্চিত্র থেকে তারা অনুপ্রেরণা লাভ করেন। এই দুই তরুণ লেখকই যোগ দেন সিপ্পির ‘গল্প বিভাগে’। রমেশ সিপ্পির প্রথম ছবি আন্দাজ ও দ্বিতীয় ছবি সীতা আওর গীতা ছবিতে সেলিম ও জাভেদ দু’জন একই সঙ্গে কাজ করেন। তারা দু’জনই চাইছিলেন অর্থ আর সুনাম। সীতা আওর গীতা ছবির অসামান্য সাফল্য সেলিম ও জাভেদকে ক্ষেপিয়ে তোলে। ছবির কাহিনী তারা লিখলেও এর সিংহভাগ সুনাম জমা পড়ে সিপ্পি প্রোডাকশনের ঘরে। আর রমেশ সিপ্পিও যথোপযুক্তভাবে তাদের নাম প্রচার করেননি বলে অভিযোগ তোলেন সেলিম ও জাভেদ। সেলিম তো রাগের মাথায় একদিন বলেই ফেললো যে, প্রযোজক পরিচালক নায়করা হলো গিয়ে জমিদার। আর আমরা লেখকেরা কি নমঃশূদ্র? রমেশের সঙ্গে সেলিম ও জাভেদের ভুল বোঝাবুঝি হয়। এক পর্যায়ে রমেশ তাদের প্রতিশ্রুতি দেন ভবিষ্যতে এমনটি আর হবে না। তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করা হবে। তারাও যেন পরবর্তী ছবিকে নিজের ছবি বলে ধরে নেয়।

*****

একটি বড় পরিবর্তনের জন্য মুখিয়ে ছিল ভারতীয় চলচ্চিত্র অঙ্গন। ১৯৭২ সালের কথা রাজেশ খান্না সে সময় বলিউডের সুপারস্টার। একে একে সাতটি ছবি ফ্লপ করে রাজেশের। দুষ্টুমিপূর্ণ চাহনি আর মিষ্টি হাসিতে পর্দা কাঁপছিল না। প্রযোজক-পরিচালকরা ক্ষতির সম্মুখীন হতে থাকেন। বেশ একটা উত্থান-পতন ঘটতে থাকে বলিউডে। সমাজেও আসতে থাকে পরিবর্তন। জয় প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করতে থাকে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায়। আশা-নিরাশার দোলাচলে উদ্বেলিত হতে থাকে ভারত। এই ক্ষেত্রেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে অমিতাভ বচ্চনের জানজির ছবিতে।

জিপি সিপ্পি এই পরিবর্তনের ধারা ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন। বদলে যাওয়ার গন্ধ পাচ্ছিলেন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার আকাশে-বাতাসে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন আইনজীবী, আর জুয়াড়ি- প্রকৃতিগতভাবে। ১৯৪৭ সালে করাচি থেকে এক কাপড়ে চলে এসে মুম্বাইতে কিভাবে সাফল্যের ফোয়ারা ছড়িয়েছেন জিপি সিপ্পি, তা আজও বলিউডে মুখে মুখে আলোচিত। তার কিংবদন্তির ব্যাপ্তিময় জীবন পরবর্তীকালে অনেকের জীবনেই গভীর রেখাপাত করে।

সব সময়ই বড় কিছু নিয়ে চিন্তা করতেন জিপি সিপ্পি। সেলিম ও জাভেদকে নির্দেশ দেন তারায় তারায় ভরপুর এমন কোনো গল্প লিখতে, যা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের। নতুন কিছু করার আহ্বান জানান তিনি।

যেই বলা সেই কাজ। সেলিম-জাভেদ লেগে পড়েন তাদের কাজে। অনেকেই তাদের কাছে কাহিনী নিয়ে আসে। দেয় নানা প্রস্তাব। অবশেষে একদিন চার লাইনের একটি কাহিনী লিখে সেলিম-জাভেদ প্রোডাকশন অফিসে গিয়ে বসেন

ÔB‡q †`w¯ nvg †bwn f‡j‡½Ô : a‡g›`, AwgZvf

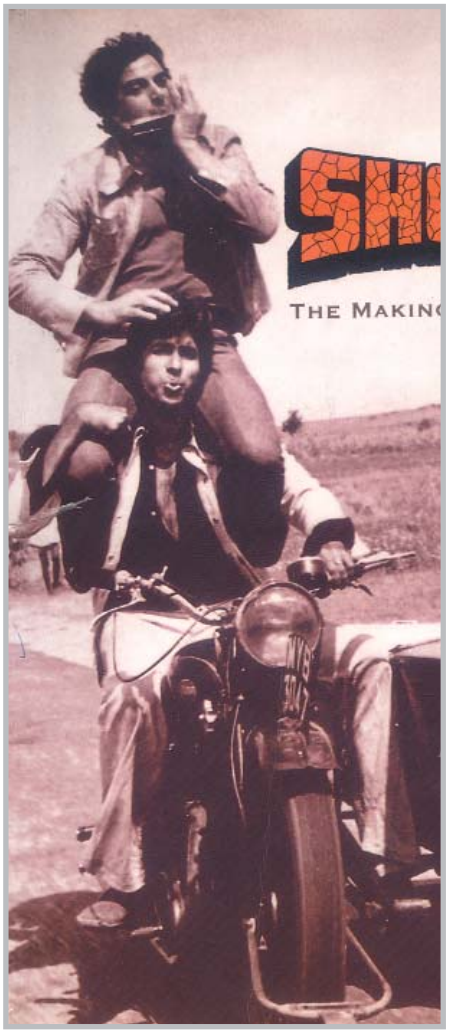

পিতা পুত্রের সঙ্গে। সেখানে তারা সংক্ষিপ্ত আকারে কাহিনী বর্ণনা করেন এভাবে- ‘একজন সামরিক কর্মকর্তার পরিবার হত্যাকান্ডের শিকার হয়। ওই কর্মকর্তা কোর্ট মার্শাল হওয়া অপর দু’জুনিয়র সেনা কর্মকর্তাকে ডেকে পাঠান। তারা দু’জন কিন্তু প্রচন্ড সাহসী। তাদের নিয়েই প্রতিশোধ নেয়ার অঙ্গীকার করেন ওই সেনা কর্মকর্তা’।

রমেশ চার লাইনের জন্য ৭৫ হাজার রুপি দিতে সম্মত হন। সে দিনের সেই বৈঠক শেষ হয় জিপি সিপ্পির সিদ্ধান্তমূলক সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে- আমি একটি বড় ছবি বানাতে চাই- চার লাইনকেই সমৃদ্ধ করো তোমরা, বানাও তিন ঘন্টার কাহিনী।

চরিত্রের জন্য

ইতিহাসের শুরুটা বড়ই সাদামাটা। বারো বাই বারো মাপের একটি কক্ষে সূত্রপাত হয়েছিলো ‘শোলে’র মতো কিংবদন্তি চলচ্চিত্রের কাহিনীর। হলদেটে ডিম লাইটের আলোয় ঘরের পরিবেশ অন্যরকম লাগতো। একটি ছোট্ট ডিভান রয়েছে ঘরে। একমাত্র জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে টেরাকোটা লাল প্রাচীর চোখে পড়তো।

সময়টা ১৯৭৩ সালের মার্চ মাস। প্রতিটা দিন সকাল সাড়ে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে সেলিম খান, জাভেদ আখতার এবং রমেশ সিপ্পি এই ঘরেই নিজেদের বন্দী ঘরে ফেলতেন। ডিভানের ওপর আধশোয়া হয়ে তারা সিনেমার প্লট নিয়ে রীতিমতো কুস্তি লড়তেন। চার লাইনের প্লট নিয়ে তৈরি হবে তিন ঘন্টার পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। আইডিয়াগুলো উত্থাপিত হতো টসের কয়েনের মতো একবার এদিকে একবার অন্যদিকে গড়িয়ে পড়তো। দৃশ্যগুলো রচিত হতো, আবার বাতিল করতেও সময় লাগতো না। কাহিনীকাররা একে অন্যের সঙ্গে যুক্তিতর্ক করতেন, ভুলগুলো শনাক্ত করে সেগুলো শোধরানোর চেষ্টায় রত হতেন। মিঠে-কড়া চা তাদের স্নায়ুকে টানটান রাখতো। মাঝে-মধ্যে চায়ের কাপের জায়গায় উঠে আসতো বিয়ারের ক্যান। মাঝে-মধ্যে প্রযোজক জিপি সিপ্পি হাজির হয়ে যেতেন।

চার লাইনের কাহিনীর পক্ষে রমেশ বাজি ধরতে রাজি ছিলেন। কিন্তু সে সময় সামরিক বাহিনীর কোনো চরিত্রকে নিয়ে ছবি নির্মাণের পরিকল্পনা হলে তা কৌশলে নিরুৎসাহিত করা হতো। অনুমোদনের হরেক রকম ফ্যাঁকড়া ছিল, সেন্সরশিপ ছিল খুবই কড়া। অগত্যা রমেশ তার লোকদের বললো ‘কুছ আওর কার দো’, অন্য কিছু একটা কর’। সেলিম-জাভেদ সামরিক চরিত্রটিকে বদলে করে দিলেন পুলিশ অফিসার।

তারা একটা বড়ো মাপের অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার তৈরি করতে চাইছিলেন। তারা চাইছিলেন শুভ আর শয়তানের একটা মহাকাব্যিক লড়াই দেখাতে। বলাই বাহুল্য যে, এর নেপথ্যে প্রেরণা ছিল হলিউডের ওয়েস্টার্ন সিনেমা। ওরা তিনজনই দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিল আকিরা কুরোসোয়ার ‘সেভেন সামুরাই’ সহ সার্গিও লিওনের কিছু ওয়েস্টার্ন ফিল্ম থেকে। সত্যি বলতে কি, ওরা ছবিতে চাইছিল বিশাল ক্যানভাস, দিগন্ত বিস্তৃত ল্যান্ডস্কেপ এবং ঘোড়ার দাপাদাপি আর ক্লোজআপে ত্রাসের দৃশ্য। অর্থাৎ একটা ভারতীয় ওয়েস্টার্ন তৈরির পরিকল্পনাই তাদের মাথায় ছিল।

সিনেমার উপাখ্যানের পুরো কাঠামো জুড়ে ছিল ভারসাম্যপূর্ণ দ্বৈত চরিত্র- দ্বৈত মানে একই চরিত্রের দুটি শাখা, আবার একই সঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র- ভালো চরিত্রের বিপরীতে মন্দ চরিত্র। কাহিনীর কেন্দ্রে ছিল ‘ঠাকুর’ চরিত্রটি- আদর্শবান, উচ্চরুচির, মার্জিত। তার বিপরীতে ছিল ভয়ঙ্কর ডাকাত- নীতিহীন, নোংরা মনের এক বর্বর। আবার পজেটিভ চরিত্রের দুটি শাখা ছিল শোলেতে। দুই বন্ধুর কথা নিশ্চয়ই সবার মনে আছে। এক বন্ধু খুবই বহির্মুখী- অর্থাৎ এক্সট্রোভার্ট, অন্যজন অন্তর্মুখী বা ইনট্রোভার্ট। ছিল দুই নারী : একজন বর্ণাঢ্য চরিত্রের, চঞ্চল প্রকৃতির- অপরজন নিঃশব্দ নারী, শুভ্রতায় আচ্ছাদিত। কোনো সন্দেহ ছিল না যে, দুই

নায়ক-দুই দোস্ত গরিবের বন্ধু এবং একে অন্যের জন্যে জান দিয়ে দিতে পারে। শোলে ছবির সেই বিখ্যাত ডাকুসর্দার গাব্বার সিং- সত্যিকারের জীবন থেকেই গৃহীত হয়েছিল তার নামটি। সেলিমের বাবা ছিলেন একজন ডিআইজি। তার কাছেই সেলিম শুনেছিলেন পঞ্চাশের দশকের ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ডাকাত গাব্বার সিংয়ের গল্প। ওই ডাকুর রীতিই ছিল পুলিশ বা পাহারাদারদের ওপর চড়াও হওয়া আর তাদের নাক এবং কান কেটে ফেলা। বাস্তব জীবনের গাব্বার সিং খাকি পোশাকের ওপর এতোটাই বীতশ্রদ্ধ ছিল যে, একবার এক ডাকপিওনকে সামনে পেয়ে তার মুখ ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিল ধারালো অস্ত্র দিয়ে। পরে গ্রামবাসীর অসন্তোষের ফলে সে তার ভুলটা বুঝতে পেরেছিল যে, খাকি পোশাক মানেই পুলিশ নয়।

শোলের স্ক্রিপ্টে বেশ কিছু নাম ঢুকে পড়েছিল বাস্তব জীবনের পরিচিত মহল থেকেই। ঠাকুর বালদেব সিং ছিলেন সেলিমের শ্বশুর যিনি তার মেয়ের বিয়ে মেনে নিতে পারেননি। মুসলমান পাত্রকে বিয়ে করার জন্যে তিনি সাত সাতটি বছর মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখেননি। সুরমা ভোপালি নামেও একজন ছিল সেলিম যাকে চিনতেন ভূপালে থাকার সময়ে। একই ভাবে নাপিত হরিরাম নাই। বীরু আর জয় ছিল সেলিমের কলেজজীবনের বন্ধু। এতোগুলো নামের মানুষ তাদের কিছু কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসহ ঢুকে পড়েছিল শোলের স্ক্রিপ্টে।

'বীরুর বিয়েপর্ব' রচনায় প্রেরণা যুগিয়েছিল বাস্তবের একজন অসন্তুষ্ট অভিভাবক। অভিনেত্রী হানি ইরানির প্রেমে পড়েছিলেন জাভেদ। 'সীতা আওর গীতা'র সেটে দু'জনের প্রথম দেখা হয়েছিল এবং সেখানেই তাদের মন দেয়া-নেয়া অধ্যায়টি জমজমাট হয়ে ওঠে। কিন্তু হানির মা পেরিন ইরানি তার মেয়ের ওপর শ্যেনদৃষ্টি রেখেছিল। জাভেদ তখনও একজন নতুন স্ক্রিপ্ট রাইটার, কাজের সন্ধানে এদিক-সেদিক ঢুঁ মেরে চলেছেন। নিজেকে তিনি বিভিন্ন অফিসে উপস্থাপন করতে শুরু করেছেন কিন্তু প্রোডিউসারদের মন খুব একটা গলাতে সক্ষম হননি। সেলিম একটু সিনিয়র জাভেদের চেয়ে। ইতিমধ্যে 'বাচপান' ছবিতে সে কাজ শুরু করেছে যার প্রযোজক আবার হানির মা ইরানি। স্বাভাবিকভাবেই জাভেদ তার সতীর্থ সেলিমকে অনুরোধ করলো তাদের বিয়ের প্রস্তাবটি পাত্রীর অভিভাবকদের কাছে উত্থাপন করতে।

পেরিন ইরানি এবং সেলিমের মধ্যে কথোপকথন ছিল নিম্নরূপ :

: ছেলে কেমন?

- আমরা পার্টনার। তার অনুমোদন ছাড়া আমি কারো সঙ্গে কাজ করার কথা ভাবতেও পারি না। কিন্তু সে প্রচুর ড্রিঙ্ক করে- দারু বহুত পীতা হ্যায়।

: কেয়া? দারু পীতা হ্যায় (কী? মদ খায়!)

- আজকাল অবশ্য বেশি খায় না, ব্যস এক-দুই পেগ। তাছাড়া এর মধ্যে তো তেমন মন্দ কিছু নেই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে মদ খাওয়ার পরে সে রেড লাইট এলাকাতে যায়।

ওই দৃশ্যের কেবল শেষ লাইনটিই ছিল ফিকশন। সংলাপটি ছিল এ রকম : 'পাত্রের পরিবার সম্পর্কে সবকিছু জানার সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে অবহিত করা হবে'।

মুভি কিংবা সত্যিকারের জীবন- কোনোটা থেকেই কোনো কিছু গ্রহণ (বা ছিঁচকে চুরি) করার ব্যাপারে মোটেই খুঁতখুঁতে ছিল না সেলিম-জাভেদ। হলিউডের ওয়েস্টার্ন মুভি ছিল উভয়ের কাছে প্রাথমিক অনুপ্রেরণা। যদিও তারা চোখ রেখেছিল দেশীয় ছবির ভাণ্ডারেই। ১৯৭১-এ মুক্তিপ্রাপ্ত রাজ খোস্‌সার ছবি 'মেরা গাঁও মেরা দেশ'-এর কেন্দ্রীয় চরিত্রে ছিল এক বাহুবিশিষ্ট মানুষ যে ছিল একজন সাবেক অপরাধী। অপরাধ জগৎ থেকে সে বেরিয়ে এসেছিল এবং গ্রামের মানুষদের ডাকাতের হাত থেকে রক্ষার ব্রত গ্রহণ করেছিল। এই চরিত্রটি আবছাভাবে প্রভাব ফেলেছিল শোলের কাহিনী রচনায়। শোলেতে দেখা যায়, জয় কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে টস্ করে। এই ব্যাপারটি গ্যারি কুপারের 'গার্ডেন অব এভিল' থেকে সংগৃহীত। কিন্তু সেলিম-জাভেদ মোটেই শস্তা অনুকরণকারী ছিল না। তাদের প্রতিভা ছিল বলেই চেনা বা পুরনো

তালিকা এমন দাঁড়ালো যা কেউ ধারণাও করতে পারেনি। কাস্টিং প্রক্রিয়া একটি জটিল প্রক্রিয়াই হয়ে উঠলো। বহু নাম আলোচনায় এলো। 'সীতা আওর গীতা'র সাফল্যের পর ধর্মেন্দ্র-হেমা মালিনী জুটি পাঁচ-পাঁচটি হিট ছবির মাধ্যমে দারুণভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। শোলেতেও কাস্ট করা হলো দু'জনকে। মীনা কুমারীর বয়ফ্রেন্ড হিসেবে পরিচিত ধর্মেন্দ্র ধীরে ধীরে মেগাস্টারে রূপান্তরিত হয়েছিল। একটি আমেরিকান ড্রিলিং কোম্পানিতে চাকরি করতো সে, কিন্তু ছবির আকর্ষণে সে ষাটের দশকের গোড়াতেই ক্যারিয়ার শুরু করলো ফিল্মে। অর্জুন হিংগোরানির 'দিল ভি তেরা হাম ভি তেরে' ছবিতে ধর্মেন্দ্র মাত্র একান্ন টাকায় সাইন করেছিল। সেখান থেকেই তার আশ্চর্য উত্থান। তার আবেদনময় অবয়ব এবং সহজ স্বতঃস্ফূর্ত হাসি শোলের বীরু চরিত্রের কাস্টিংয়ের ব্যাপারে অনিবার্য করে তুলেছিল।

সীতা আওর গীতায় অভিনয় করে হেমা মালিনী পান ফিল্মফেয়ার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার। এভাবে সে বলিউডের শীর্ষস্থানে পৌঁছে গিয়েছিল।

kU¨`‡"Qb a‡g›` I AwgZvf

বিষয়ই নতুন চমক হিসেবে দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত হতো।

পাক্কা পনেরো দিন স্বল্পালোকিত সেই কক্ষে তর্ক-বিতর্ক গ্রহণ-বর্জনের পর নতুন ছবির আউট লাইন প্রস্তুত হলো।

***

রাহুল দেব বর্মণ ও আনন্দ বক্শীর টিম সঙ্গীতকার- গীতিকার হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হলেন। বলাই বাহুল্য যে, সবার চোখ ছিল নায়ক-নায়িকা, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দিকে। কাস্টিং তালিকা হলো যাদের নিয়ে তারা হলেন ধর্মেন্দ্র, হেমা মালিনী, অমিতাভ বচ্চন, জয়া ভাদুড়ী, সঞ্জীব কুমার এবং ড্যানি দেংজংপা।

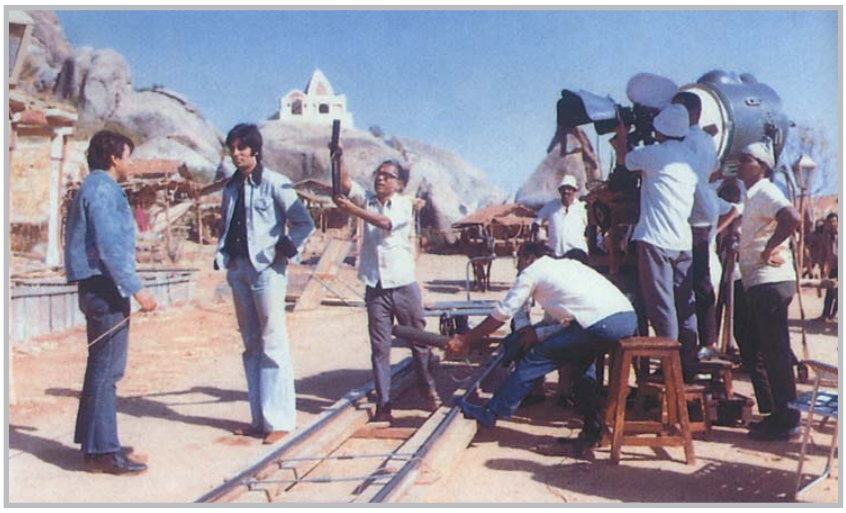

বহু তারকার সমাবেশ ঘটছে শোলে ছবিতে এমন প্রাথমিক ধারণা তৈরি হলেও ছবির কাহিনী যখন চূড়ান্ত রূপ পেতে থাকলো তখন চরিত্রের

কিন্তু শোলের টাংগাওয়ালির, মানে ঘোড়ার গাড়ির চালক চরিত্রে অভিনয়ের ব্যাপারে হেমার খুব বেশি একটা আগ্রহ ছিল না। 'আন্দাজ' এবং 'সীতা আওর গীতা'র মূল পুঁজি ছিল সে। অথচ এই ছবিতে তার অভিনীত টাংগাওয়ালি বাসন্তীর চরিত্রের জন্যে বরাদ্দ মাত্র সাড়ে পাঁচখানা দৃশ্য। রমেশের কাছে সে বিস্ময় প্রকাশ করলো এভাবে- 'এটা কী হলো?' রমেশ খোলাখুলি জানালো - 'এটা তোমার ছবি নয়, এটা হচ্ছে সঞ্জীব আর গাব্বার সিংয়ের ছবি। তবে তোমার চরিত্রটাও খুবই ইন্টারেস্টিং।' রমেশ শেষ পর্যন্ত হেমাকে প্রভাবিত করতে পারলো এবং হেমা সম্মত হলো। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল দ্বিতীয় প্রধান পুরুষ চরিত্রটা কে করবে? ডিস্ট্রিবিউটররা শত্রুঘ্ন সিনহার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু সেলিম-জাভেদ ছিলেন অমিতাভ বচ্চনের পক্ষে। লেখকদ্বয়ের মতে, অমিতাভ হলেন একজন

ব্যতিক্রমী অভিনয়শিল্পী। বিখ্যাত হিন্দি কবির বড় ছেলে অমিতাভ কোলকাতার এক জাহাজ কোম্পানিতে কাজ করার পাশাপাশি অভিনয়ে আসার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ভাগ্য তার শিকে ছিঁড়ছিল না। অল ইন্ডিয়া রেডিওতে তার কণ্ঠস্বর গৃহীত হলো না। তার একের পর এক ছবি ফ্লপ হতে লাগলো। 'দুনিয়া কা মেলায়' তাকে বাতিল করে নেয়া হলো সঞ্জয় খানকে। কিন্তু সেলিম-জাভেদ তার ওপরে আস্থা রেখেছিল এবং প্রকাশ মেহ্‌রাকে রাজি করিয়ে ছিল 'জাঞ্জির' ছবিতে তাকে সুযোগ দেয়ার ব্যাপারে।

রমেশ প্রায় প্রস্তুত ছিলেন শত্রুঘ্ন সিন্‌হাকে কাস্ট করার জন্যে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি বুঝতে পারলেন যে, তার মতো একজন মেগাস্টারকে কাস্ট করলে ছবিতে মেগাস্টারের সংখ্যা তিনে দাঁড়াবে। সেটাতে তিনজনের ভেতর ইগো প্রব্লেম তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। অমিতাভ অভিনীত 'বোম্বে টু গোয়া' ও 'আনন্দ' ছবি দুটো দেখে রমেশ অমিতাভের প্রতিভায় মুগ্ধ হলেন। ইতিমধ্যে ধর্মেন্দ্রকে সে রাজিও করিয়েছে তার অভিনয়ের ব্যাপারে মুখ খোলার জন্য। লবিংয়ে কাজ হলো এবং জয়ের চরিত্রে চূড়ান্ত করা হলো অমিতাভ বচ্চনকে।

ঠাকুর চরিত্রটির জন্য শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল প্রাণ, এককালের হিন্দি ছবির খলনায়ক। ক্রমশ সে পার্শ্ব অভিনেতার চরিত্রে আলোচিত হয়ে উঠছিল। এমনকি সিপ্পি প্রোডাকশন নির্মিত 'মেরে সানাম' ও 'ব্রহ্মচারী' ছবিতে সে অভিনয়ও করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রমেশ সঞ্জীব কুমারকেই বেটার চয়েস হিসেবে বিবেচনা করলেন। সীতা আওর গীতায় সঞ্জীব নায়কের চরিত্রে অভিনয় করলেও চরিত্রাভিনেতা হিসেবে তার প্রতিভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'খিলোনা', কোশিস', 'পরিচয়'-এর মতো ছবিতে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। সনাতন গুজরাটি পরিবারে জন্ম নেয়া সঞ্জীব সিনেমায় এসেছিল মঞ্চাভিনয়ের মাধ্যমে। ইন্ডিয়ান পিপলস্ থিয়েটার এসোসিয়েশনে (আইপিটিএ) সে সাধারণত প্রবীণ লোকের চরিত্রেই অভিনয় করতো। যদিও সে দেখতে বুড়ো ছিল না। ত্রিশ বছরের যুবকের সত্তর বছরের বৃদ্ধের চরিত্রে সফল রূপদান থেকেই অনুমান করা যায় সে অভিনেতা হিসেবে কোন স্তরের। আইপিটিএ-র এক শীর্ষ ব্যক্তিকে সঞ্জীব প্রশ্ন করেছিল, তাকে কেন হিরোর চরিত্রে দেয়া হয় না। উত্তরে ভদ্রলোক বলেছিলেন, তোমাকে যদি শুরুতেই নায়কের চরিত্র দেয়া হতো তাহলে চিরকাল নায়কই থেকে যেতে, অভিনেতা আর হয়ে উঠতে না। একই কথা খাটে জয়া ভাদুড়ীর ক্ষেত্রেও। এই অসামান্য শিল্পী তার অভিনয় জীবন শুরু করেছিলেন সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর'-এ একটি ছোট্ট চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে। অথচ পরে তিনি ঘুড্ডি ছবির মাধ্যমে বড়ো তারকা বনে গিয়েছিলেন। শোলেতে বিধবার চরিত্রটি বিশেষ বিকশিত নয়, বাসন্তীর তুলনায় দৃশ্য সংখ্যাও কম। আক্ষরিক অর্থেই চরিত্রটি কম বর্ণিল। কিন্তু চোখের চাহনি, মুখের অভিব্যক্তি, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ- এসবের কাজ আছে চরিত্রটিতে। আর সে কালে এই চরিত্রটি সার্থকভাবে করার জন্য ইন্ডাস্ট্রিতে দ্বিতীয় কোনো নারীও ছিল না। চরিত্রটিতে অভিনয়ের ব্যাপারে খুব একটা নিশ্চিত ছিলেন না জয়া। কিন্তু টিমে তিনি অমিতাভ বচ্চনকে দেখলেন- উভয়ের একসঙ্গে অভিনয়কৃত দুটো ছবি (এক নজর, বাঁশি বিরজু) ফ্লপও হয়েছে। 'জাঞ্জির' ও 'অভিমান' ছবি দুটো মুক্তির অপেক্ষায়। অমিতাভ জয়াকে বোঝালো- 'সব কিছু ঠিক আছে, আমরা একসঙ্গে অভিনয় করবো, এটা চমৎকার ছবি, সেট আপও দারুণ- তোমাকে স্যুট করবে।' অমিতাভের কথায় জয়া রাজি হলো।

গুরুত্বপূর্ণ ডাকাতের চরিত্রে ভাবা হলো ড্যানি দেংজোংপাকে। ভারতের চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট থেকে গ্র্যাজুয়েশন করা ড্যানির চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল 'ধুন্দ' সিনেমায় হুইল চেয়ারে বন্দি বিকারগ্রস্ত স্বামীর নেতিবাচক চরিত্রটি করার পর। ড্যানির কাস্টিংয়ের ব্যাপারে জাভেদ তেমন উচ্চবাচ্য করেনি। তবে ড্যানি ছিল মেধাবী অভিনেতা, তার চোখও ছিল উত্তেজক। সংলাপ পেয়ে চরিত্রগুলো শ্বাস নিতে শুরু করলো। কংকালের কাঠামো রক্ত মাংসের মানুষরূপে জীবন্ত হলো, স্ক্রিপ্টও পেলো নতুন মাত্রা। আসলে প্রথমে সংলাপ নিয়ে আলোচনা হতো, তারপর সেটা লিখে ফেলা হতো। জাভেদের দায়িত্ব ছিল কাগজে-কলমে সংলাপ ধরে রাখা। কিন্তু সমস্যা হলো জাভেদের হস্তাক্ষর ছিল দুঃসাধ্য। সে দ্রুত লিখে যেতো উর্দুতে, কোনো কাটাকুটি কিংবা পুনর্লিখনের বালাই ছিল না। জাভেদের অ্যাসিস্টেন্ট খালিশ উর্দু থেকে লিখতো হিন্দিতে, অমরজিৎ নামে আরেক অ্যাসিস্টেন্ট ঐ লিখিত দৃশ্যটির সার সংক্ষেপ এক লাইনে লিখে ইংরেজিতে টাইপ করতো।

প্রতিটা লাইন গাব্বার সিংকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিচ্ছিল। দিন আনি দিন খাই মার্কা ডাকাত সে নয়, সে জীবনের সীমানা পেরুনো এক খলনায়কের প্রতিকৃতি, সার্গিও লিওনের মন্দলোকের আদলে রচিত। জাভেদের ভাষায়- গাব্বার সিংয়ের দেশ হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ আর মেক্সিকোর মাঝামাঝি একটা স্থানে। মানুষ হিসেবে সে আনপ্রেডিক্টেবল, তার সম্পর্কে আগাম কোনো ধারণা দেয়াই চলে না। তার ভাষা চেনা, কিন্তু দম্ভপূর্ণ। গঙ্গা যমুনা ছবির প্রভাব পড়েছে তার বাচনভঙ্গীতে। তার কথার ভেতর এমন একটা উদ্ভট রূঢ়তা, শব্দ নির্বাচনে স্যাডিসম এবং ভায়োলেন্স প্রকাশ পেতো যে লাখ লাখ ভারতীয় নাগরিক সংলাপগুলো আউড়াতো। তার সংলাপের ধারণকৃত ক্যাসেট বিক্রির ব্যাপারে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল।

সাম্ভা চরিত্রটি সৃষ্টি করা হয়েছিল একটি বিশেষ দৃশ্যের জন্য। গাব্বার সিংয়ের মাথার দাম হাঁকা হয়েছিল পঞ্চাশ হাজার রুপি। বার্তাবাহকের মাধ্যমে গাব্বারের কাছে এই তথ্যটি পৌঁছুবে। কিন্তু গাব্বারের দাম্ভিকতা বোঝানোর জন্য লেখক অন্যভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করলেন। বিষয়টি এ রকম:

গাব্বার সিং : আরে ও সাম্ভা, কিত্‌না ইনাম রাখে হ্যায় সরকার হাম পার? (সাম্ভা, আমার মাথার দাম কতো ঘোষণা করেছে সরকার?)

সাম্ভা : পুরে পাঁচাস হাজার (পুরো পঞ্চাশ হাজার)

গাব্বার সিং : সুনা, পুরে পাঁচাস হাজার (শুনেছো, পুরো পঞ্চাশ হাজার)।

গাব্বারের ভাষা এতো শক্তিশালী ছিল যে যখন সংলাপ বর্ণনা করা হলো সমাবেশে তখন অমিতাভ গাব্বারের চরিত্রটি করতে চেয়েছিল। সে-সময় একমাত্র সেলিম-জাভেদ জুটিই পুরো সিনেমা বর্ণনা করতো। চমৎকার নেটওয়ার্ক ছিল সেটা। একজন কাহিনী বলে যেতেন। অন্যজন কোনো বিশেষ বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আরো কিছু কথা বলতেন। ফলে শ্রোতাদের কাছে কাহিনী শোনার বিষয়টি হয়ে উঠেছিল সিনেমা দেখার মতোই, ফ্রেম বাই ফ্রেম চোখের সামনে ভেসে উঠতো। অমিতাভের ধারণা হলো যে গাব্বার সিংই বেটার রোল।

সঞ্জীব কুমার প্রথমে স্ক্রিপ্ট শুনে মুষড়ে পড়েছিল ভায়োলেন্সের ধরন দেখে। জাভেদের ভাষ্য ছিল এ রকম : মধ্য বিরতিতে পৌঁছবার আগেই তোমার মুখ আহত হবে, তোমার নাকের ওপর একটা ঘুষি এসে পড়বে। শুনে সঞ্জীব ছবি করতে রাজি হলো বটে কিন্তু চাইলো ঘুষিদাতা ড্যানির চরিত্র। অবশ্য এজন্যে সে পরে পীড়াপীড়ি করেনি। সে বুঝেছিল যে খলনায়ক তো খলনায়কই। রাবণ যতোই আকর্ষণীয় হোক রাম সর্বসময়েই এগিয়ে। শোলের স্ক্রিপ্ট এতো দারুণ শেপ নিলো যে প্রত্যেক অভিনেতাই নিজের অভিনীত চরিত্রের বাইরে অন্য চরিত্র দ্বারা আলোড়িত হচ্ছিলো। ধর্মেন্দ্র বাচ্চা ছেলের মতো স্ক্রিপ্ট শুনলো এবং ঘোষণা দিল সে ঠাকুরের চরিত্রটি করতে আগ্রহী। তার অভিনয় সত্তা তাকে ঠিকই বলে দিয়েছিল যে সে হতে পারে নায়ক কিন্তু শোলে হচ্ছে ঠাকুরের কাহিনী। ঠাকুরই কেন্দ্রীয় চরিত্র। ধর্মেন্দ্রর আগ্রহ দেখে রমেশ বললো, 'তাহলে এ নিয়ে আমরা আলাপ করতে পারি। কিন্তু ভুলে যেওনা ঠাকুরের রোলটি হচ্ছে চরিত্রাভিনেতার। যদি তুমি সেটা করো তাহলে তোমার ছেড়ে দেয়া রোলের সৌজন্যে সঞ্জীব ছবির শেষে এসে হেমা মালিনীকে পাবে।' হেমা-ধর্মেন্দ্র রোমান্স মাত্র শুরু হয়েছে, ওদিকে সঞ্জীব একবার প্রস্তাবও দিয়েছে তাকে। ধর্মেন্দ্র একবার তাকালো রমেশের দিকে, তারপর বললো, বীরুই ভালো।

***

পুরো টিমের একটাই মূলমন্ত্র ছিল : কোনো আপোস নয়। রমেশ অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক মানুষ। অপ্রধান চরিত্রগুলো নিয়ে বিশদ আলোচনা শুরু হলো। আসরানি ছিল সে সময়ের একজন জনপ্রিয় কমেডিয়ান। জেলারের চরিত্রের জন্যে তাকে ডাকা হলো। জাভেদ চরিত্রটির বর্ণনা দিল, ব্যাখ্যা করলো সেলিম। রাজি হলো আসরানি।

দ্বিতীয় সিটিংয়ের সময় জাভেদ হাতে করে নিয়ে আসলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওপর লেখা বই। সেখানে হিটলারের প্রচুর ছবি ছিল। জেলারের গেটআপ হবে হিটলার ঘরানার, কিন্তু ভাবভঙ্গিতে সে একজন চ্যাপলিন। একজন চার্লি চ্যাপলিন

যদি হিটলারের মতো কঠোর হতে চায় তখন যে-দশা হবে ঠিক সে রকম। আখতার ভাই পোশাক তৈরি করবেন, আর উইগ নির্মাতা কবির তার চুলের স্টাইল ঠিক করে দেবে। আসরানি তো মুগ্ধ- তার মন্তব্য ছিল, 'এতো ছোট একটা রোলের জন্য এতোসব আয়োজন, এরা তো দুর্দান্ত কাজ করছে।'

সিপ্পি প্রোডাকশনের সঙ্গে জগদীপ যুক্ত নয় বছর বয়সে থেকে। 'সাজা' ছবিতে নয় বছরের বালক গানও গেয়েছিল। সুর্মা ভোপালীর চরিত্রটির জন্যে তাকে ঠিক করা হলো। অবশ্য জগদীপ কখনোই ভুপালে যায়নি, তো একবার শুটিংয়ের পর আড্ডায় কয়েকজন ভূপালী মহিলা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল, জগদীপ সঙ্গে সঙ্গে ওদের ফলো করতে শুরু করলো। পরবর্তীকালে এই বিষয়টি নিয়ে অনেক হাস্যরস হয়েছে।

ছবির নামকরণ করা হলো 'শোলে'- Sholay, ই-এর বদলে এ এবং ওয়াই সহযোগে লেখা হলো সেটা। কারণ ১৯৫৩ সালে বিআর চোপরা একই নামে ছবি করেছিল। তার বানান ছিল shole, এবং ছবিটা জাভেদ দেখেছিল ছেলেবেলায়, ওই শোলে ছিল পুঁচকে একটা সিনেমা, আর এই শোলে তো রুদ্ধশ্বাস অ্যাকশানের, বিশাল ক্যানভ্যাসের।

জিপি সিপ্পি ডাকাতের পোশাকের ব্যাপারে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিলেন। তখনকার সব সিনেমা ডাকাতদের রূপ ছিল একই রকম। ধুতি পাগড়ি পরতো তারা, মাথায় থাকতো চার ইঞ্চি টিকি, 'মা ভবানী' থাকতো তাদের ঠোঁটের আগায়, কিন্তু শোলে হচ্ছে আধুনিক ছবি। সেখানে এসব চলবে না। ডাকাতের অনুতাপ কিংবা হঠাৎ ভালো হয়ে যাওয়া এখানে বেমানান। বলা হলো, গাব্বার সিং হচ্ছে সাক্ষাৎ শয়তান, ভালো ও মন্দের পার্থক্য সে বোঝে না।

লোকেশনের সন্ধানে

গিরিখাত রমেশের পছন্দ নয়। সে চাইছিল এমন একটা স্পট যেখানে সভ্যতার কোনো ছায়া পড়েনি। আর দশটা সিনেমার ডাকাত দলের মতো নয় শোলের ডাকাত বাহিনী। তাই সব কিছুতে আলাদা হতে হবে। রমেশ স্মরণ করলো আর্ট ডিরেক্টর রাম ইয়াদেকারকে। ইয়াদেকার একটা আপোসহীন চরিত্র বটে, চোস্ত ইংরেজি বলতো। সাধারণত বিদেশী ফিল্ম প্রোজেক্টেই সে কাজ করতো। মাঝেমধ্যে একটা আধটা হিন্দি ছবিতে নিজেকে জড়াতো। আগেই বলেছি যে, মেরা গাঁও মেরা দেশ-এর প্রেরণা কাজ করেছিল শোলে ছবির মূল গল্পে। ছবিটির ডিরেক্টর ছিল এই ইয়াদেকার। রমেশের আহ্বানে সে তৎক্ষণাৎ সাড়া না দিয়ে বরং প্রশ্ন করলো- 'আমাকে কেন'? রমেশ সোজাসাপটা উত্তর দিল- যেহেতু তুমি মেরা গাঁও মেরা দেশ করেছো, তাই।

রমেশের মতোই ইয়াদেকার রাজস্থানে শুটিং করার পক্ষপাতী ছিল না। কারণ সিনেমায় ডাকাতদের গ্রাম হিসেবে রাজস্থান অত্যন্ত পরিচিত হয়ে উঠেছিলো। ইয়াদেকার বরং দক্ষিণে লোকেশন নির্বাচনের পক্ষে রায় দিল। রমেশ পছন্দ করলো আইডিয়াটা।

kw³ kvjx RwU †mwjg Lvb I Rv‡f` AvKZvi

সিনেমার ক্রিস্টোফার কলম্বাসের মতো ইয়াদেকার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো লোকেশনের সন্ধানে, সঙ্গে ড্রাইভার আর বাবুর্চি। ম্যাঙ্গালোর, ব্যাঙ্গালোর, কোচিনের শত শত মাইল সে চষে বেড়ালো। ঘুরতে ঘুরতে যেখানে শ্রান্ত হয়ে পড়তো সেখানেই গাড়ি থামিয়ে রান্না চাপাতো, খেয়ে দেয়ে গাড়ির ভেতরেই ঘুম। ঠাকুরের বাড়ি হবে পাহাড়ের চূড়ায়, আর নিচের দিকে সাধারণ মানুষের গ্রাম- রমেশের এমন চাহিদামতো লোকেশন আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। হঠাৎ একদিন ব্যাঙ্গালোরের পথে গাড়ি চলার সময় ইয়াদেকারের স্মরণে এলো যে কয়েক বছর আগে সে এখানে 'মায়া' নামে একটি ইংরেজি ছবির কাজ করেছিল। সে ড্রাইভারকে বললো একই ধরনের পাহাড়ি এলাকায় নিয়ে যেতে। বিকেলের দিকে তারা পৌঁছুলো রামানগরামে। ইয়াদেকার ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলো সত্যিই কি এটা সেই জায়গা যেখানে ওই ইংরেজি ছবিটার শুটিং হয়েছিল? সকলে মিলে নিশ্চিত হলো লোকেশনের ব্যাপারে। এক জায়গায় গিয়ে পথ এমন সংকীর্ণ হয়ে গেছে যে গাড়িতে আর যাওয়া সম্ভব নয়, সামনে ঝোঁপঝাড়। অগত্যা ইয়াদেকার কয়েক মাইল পায়ে হেঁটেই সামনের দিকে এগুলো। দু'ঘণ্টা সে থাকলো স্পটটিতে। তারপর ফিরে এলো ব্যাঙ্গালোরে। রমেশকে ডাকলো। তাকে জানিয়ে দিল যে দুটো পছন্দ আছে- একটি ব্যাঙ্গালোর-মুম্বাই হাইওয়ের পাশে টুমকুর অঞ্চল, অপরটি রামানগরাম।

রামানগরাম ব্যাঙ্গালোর থেকে গাড়িতে একঘণ্টার পথ। উঁচু উঁচু দালানের সমান কালো পাথর আকাশের দিকে মাথা তুলে আছে। রমেশ পছন্দ করলো জায়গাটা। পরের দিনই সে সিনেমাটোগ্রাফার দোয়ার্কা দিবেকা এবং দু'জন আসিস্ট্যান্ট নিয়ে উড়াল দিল সেখানে। দিবেকা তো একেবারে মুগ্ধ- 'আমার কল্পনাশক্তিকে ছাপিয়ে গেছে জায়গাটা, সত্যিই দারুণ।' সে লোকেশন হিসেবে জায়গাটাকে চূড়ান্ত করলো।

রামানগরাম ছিল খাঁখাঁ শূন্য এলাকা। কল্পনার জগৎ নির্মাণের জন্য যে-অঞ্চল ছিল প্রতীক্ষায়। জনশূন্য এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ ছিল সত্যিই এক জটিল প্রক্রিয়া। পুরো গ্রামই তো বিনির্মাণ করতে হয়েছে। একজন সামরিক ব্যক্তি সরেজমিনে প্রদক্ষিণ করলেন, কৃষকদের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হলো, তারপর শুরু হলো কাজ। ১০০ জন মানুষ দিন রাত পরিশ্রম করে শুটিংযোগ্য করে তুলতে লাগলো লোকেশন। মুম্বাই থেকে ৩০ জন এবং স্থানীয় ৭০-৮০ জন ওই কাজে নিয়োজিত হয়েছিল। ঠাকুরের বাড়ি থেকে গাব্বার সিংয়ের আস্তানা পায়ে হাঁটা দূরত্বের। একটা মসজিদ আর একটা মন্দিরের সেটও স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী তৈরি করা হলো।

বাস্তবসম্মত সেট নির্মাণ করা সহজ ছিল না। আজিজ হানিফ শেখ নামে একজন অভিজ্ঞ কর্মচারীকে খুঁজে বের করলো রমেশ। সকল সমস্যার সমাধানকারী হিসেবে তার সুখ্যাতি ছিল। তিনি ছোট ছোট কুটির তৈরি করালেন, পানির কল বসলো, রাস্তা তৈরি হলো।

আজিজ শেখের প্ল্যান ছিল খুবই উপযোগী। গাব্বার সিংয়ের ডেরা তৈরি হলো ঠাকুরবাড়ির পেছনেই। গ্রামবাসীদের বাড়ির ভেতরেই এটাচড বাথরুমসহ মেকআপরুম বানানো হলো, ভদ্রোচিত পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা হলো। হাজার লোকের খাবার রান্নার মতো হেঁশেল- গোডাউন সব হলো।

ব্যাঙ্গালোর হাইওয়ে থেকে রামানাগারাম পর্যন্ত যাওয়ার সড়ক পথও স্থাপিত হলো। বসানো হলো টেলিফোন লাইন। এইসব কিছুই সম্পন্ন হলো মাত্র দুই মাসের ভেতর।

সে সময়ে রমেশ অবস্থান করছিলেন মুম্বাইয়ে। শুরু হয়ে গেল 'মিউজিক সিটিং'। রাহুল দেব বর্মণ সত্তরের দশকে ছিল সৃষ্টিশীলতার উত্তুঙ্গ পর্যায়ে। পঞ্চম বা রাহুলদেব বর্মণ সঙ্গীতে কোনো আইন মানতো না, এমন কি উচ্চাঙ্গসঙ্গীত কম্পোজের সময়েও ব্যাকরণের তোয়াক্কা করতো না। তার কথা ছিল: কানে ভালো শোনালেই সেটা ব্যাকরণ।

আর ডি বর্মণের কাজের ধরন ছিল এ রকম: সে তার পরিচালককে গল্পটা শোনাতে বলতো, মোটা দাগে গল্প শোনালেই হলো, কিন্তু গানের সিচুয়েশান শোনাতে হতো বিশদভাবে। জাভেদ গল্প বলতো, রমেশ গানের পরিবেশ বর্ণনা করতো সহকারী সেটা লিখে নিতো, আর ডি বর্মণ দশটি সুরের মুখ কম্পোজ করে রাখতেন এক সিটিংয়ে। পরের সিটিংয়ে সেগুলো থেকে পাঁচটি বেছে নিয়ে পরিমার্জন করে উপস্থাপন করতেন। আবার এমনও হতো সবগুলো বাতিল করে নতুন কোনো সুর রচনা করতেন। সবার আগে তৈরি হয়ে গেল 'কোই হাসিনা জাব রুঠ যা তি হ্যায়' গানটি।

আর ডি বর্মণের ক্ষেত্রে যেটা বেশি হয়েছে

সেটা হলো তিনি প্রথমে সুর রচনা করেছেন, সেই সুরের ওপর গীতিকার কথা বসিয়েছেন। আনন্দ বক্শি আশ্চর্যজনক দ্রুততায় সেই সুরের ওপর কথা বসিয়েছেন শোলে ছবির জন্যে। এমনকি একটা গান লিখতে তার ত্রিশ মিনিট লেগেছে এমন নজিরও আছে।

রাজকমল স্টুডিওতেই শোলের বেশির ভাগ গান রেকর্ড করা হয়েছে। তখনো পর্যন্ত মাল্টিট্র্যাকিং সিস্টেমের চল ঘটেনি। সে সময় রাজকমল স্টুডিওতেই কেবল ছয় ট্র্যাকের সিস্টেম চালু ছিল। কোনো কোনো শিল্পী মাঝে-মধ্যে ডাবিংয়ের সুবিধা নিতেন। কিন্তু ষাট-সত্তরজন যন্ত্রশিল্পীকে একসঙ্গে বাজাতে হতো। একজনের ভুল করা মানে আবার প্রথম থেকে রেকর্ড শুরু করা। সে সময় সন্তুর এবং বাঁশিতে ছিলেন দুই গুণী শিল্পী- শিব কুমার শর্মা এবং হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া।

শোলে ছবির জন্যে গান গেয়েছিলেন কিশোর কুমার, মান্না দে, ভুপিন্দর এবং আনন্দ বক্শী স্বয়ং। সুরমা ভোপালী ও তার দল নিয়ে একটা কাওয়ালী পরিবেশনের কথা ছিল যা ভূপালের মৃতপ্রায় ধারা 'চার বাঁন্দ'-এর আঙ্গিকে কম্পোজ হয়েছিল। কিন্তু সিনেমার দৈর্ঘ্য এমনিতেই এতো লম্বা হয়ে গিয়েছিলে যে, কাওয়ালীপর্ব আর শুট করা হয়নি। ফলে 'শোলে' ছবিতে গানের সংখ্যা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় পাঁচটিতে।

ওই পাঁচটি গানের জন্য পাঁচ লাখ টাকা অগ্রিম রয়্যালিটি দিয়েছিল 'পলিডোর কোম্পানি'। সে সময়ে এক গানের জন্য এক লাখ টাকা প্রদান একেবারে অভূতপূর্ব ঘটনা। সে সময়, অর্থাৎ সত্তর দশকের শুরুর দিকে গানের বাজার এতো রমরমা ছিল না। এইচএমভি নামে একটি মাত্র কোম্পানি মনোপলি ব্যবসা করতো। তাই তাদের কথাই ছিল সঙ্গীতজগতের আইন। সেই মনোপলি 'পলিডোর' এসে ভেঙে দিল এবং সর্বপ্রথম অগ্রিম অর্থ প্রদানের রীতি চালু করলো। রমেশ বিয়ে করলো 'পলিডোর'-এর স্বত্বাধিকারী শলী প্যাটেলের ভগ্নি গীতাকে। পাঁচ লাখ অগ্রিম প্রদানের কারণে পলিডোর-এর রেকর্ড বিক্রির টার্গেট গিয়ে দাঁড়ালো এক লাখ কপিতে। যদিও সে সময় ২৫ হাজার রেকর্ড বিক্রি হলেই ধরে নেয়া হতো ভালো ব্যবসা হয়েছে!

ওদিকে শোলের প্রধান খলনায়ক চরিত্রে ড্যানির অভিনয় করার কথা থাকলেও সে ফিরোজ খানের 'ধর্মাত্মা' ছবির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলো। শিডিউলের সমস্যা হয়ে গেল। আগে পিছে করে সমন্বয়ের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলে ড্যানি সিদ্ধান্ত নিলো 'শোলে' ছবি থেকে সরে দাঁড়ানোর। গাব্বার সিং সাজা হলো না তার।

গাব্বার সিং-কে নিয়ে অনেক নাটক

প্রবেশপথ জুড়ে দাঁড়ালো এসে একজন আমজাদ খান। সে দীর্ঘদেহী মানুষ নয়, কিন্তু তার পা টেনে টেনে চলার ধরন, পুরু মুখাবয়ব এবং কোঁকড়ানো চুল তাকে স্বকীয়তা দিয়েছে। রমেশ ডিভানে শুয়ে ছিল, ক্রেন তোলার ভঙ্গিতে তার মাথা বিছানা থেকে উঁচু হয়ে ডান দিকে কাৎ হলো। লো অ্যাঙ্গেল থেকে আমজাদকে রমেশের লম্বা মনে হলো। ব্যস, কিছু একটা ক্লিক করে গেল। রমেশ বলে উঠলো, 'বাহ, মজার চেহারা, আমার তো ভালোই মনে হচ্ছে।'

ড্যানির প্রস্থানের পর রীতিমতো একটা ভীতিকর অবস্থা বিরাজ করছিল। শুটিং এক মাস পিছিয়ে আছে। গাব্বার সিংতো আর যেনতেন চরিত্র নয় যে একজনকে দিয়ে করালেই হলো। একঝাঁক তারকার বিপরীতে তাকে মেধা আর কারিশমা নিয়ে দাঁড়াতে হবে। ভুল অভিনেতা নির্বাচন পুরো ছবিটার বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে। আবার ইতিমধ্যে তারকাদের ইগো ম্যানেজ করতে হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে। এরকম একটা অবস্থায় আমজাদ খানের নাম সামনে চলে এলো।

আমজাদ হচ্ছে চরিত্রাভিনেতা জয়ন্তর সন্তান। নিজের অবস্থান তৈরির জন্য সে সংগ্রাম করে চলেছে। 'পাথ্থার কে সানাম' ছবিতে তার নায়কের চরিত্রে অভিনয় করার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ছবিটা আর নির্মিত হয়নি। 'লাভ অ্যান্ড গড' ছবিতে সে পরিচালকের সহকারী হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু থিয়েটারে তার যথেষ্ট সুনাম আছে। ১৯৬৩ সালে দিল্লিতে বার্ষিক যুব উৎসবে তার অভিনয় দেখেছিল জাভেদ। 'অ্যায় মেরে ওয়াতান কে লোগো' নাটকে আমজাদ একজন আর্মি অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করেছিল। এর পরের বছর আমজাদকে অভিনয় করতে দেখেছিল মুম্বাইয়ের মঞ্চে। রমেশের বোন সনি হয়েছিল আমজাদের মা।

সেলিম আমজাদের বাবাকে চিনতো, সে তাদের বাড়িতেও যেতো যখন আমজাদ ছিলো নিতান্ত বালক। পরে আমজাদের অভিনয় প্রতিভা সম্পর্কে জেনেছিল সেলিম। সে আমজাদকে বললো, আমি তোমাকে কোনো কথা দিচ্ছি না, পরিচালকের কাছে তোমাকে নিয়ে যাব, বিশাল এক সিনেমা হচ্ছে। যদি তুমি এই চরিত্রে পেয়ে যাও তাহলে সেটা তোমার ভাগ্য কিংবা তোমার চেষ্টা।

আমজাদকে চরিত্রের জন্য যোগ্য মনে হলেও সে তো সিনেমায় একজন অখ্যাত ব্যক্তি। সে কি চরিত্রটি শেষ পর্যন্ত দাঁড় করাতে পারবে? তাকে বলা হলো দাড়ি রাখতে, তারপর এসে দেখা করতে। সেলিম-জাভেদের অবশ্য ধারণা যে আমজাদই হচ্ছে সঠিক নির্বাচন।

চারদিন পর স্ক্রিন টেস্ট হলো আমজাদের। উতরে গেল সে। আমজাদ অস্থির হয়ে পড়লো সুখবরটা হাসপাতালে গিয়ে ওর স্ত্রীকে জানানোর জন্যে। দিনটি ছিল ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ সাল। আমজাদের ছেলে শাদাব ওই দিনই বিকেল চারটা বেজে দশ মিনিটে ভূমিষ্ঠ হলো।

কাগজের পৃষ্ঠা থেকে শোলে ধীরে ধীরে জীবন্ত হয়ে উঠতে লাগলো, বাস্তব রূপ পেতে থাকলো। সিপ্পি চাইলো তার জীবনের সবচেয়ে বড় এবং শ্রেষ্ঠ সিনেমা বানাতে। সনাতন ৩৫ মিলিমিটার ফর্ম্যাটে সেটি সম্ভব নয়। তাই সিদ্ধান্ত হলো শোলে হবে ভারতের প্রথম ৭০ মিমি ফর্ম্যাটের ছবি এবং তার শব্দ হবে স্টেরিওফোনিক। সে সময় হলিউডের বিগ বাজেটের ছবিগুলো এই ৭০ মিমি ফরমেটে বানানো হতো। যেমন ম্যাকানাস গোল্ড। কিন্তু

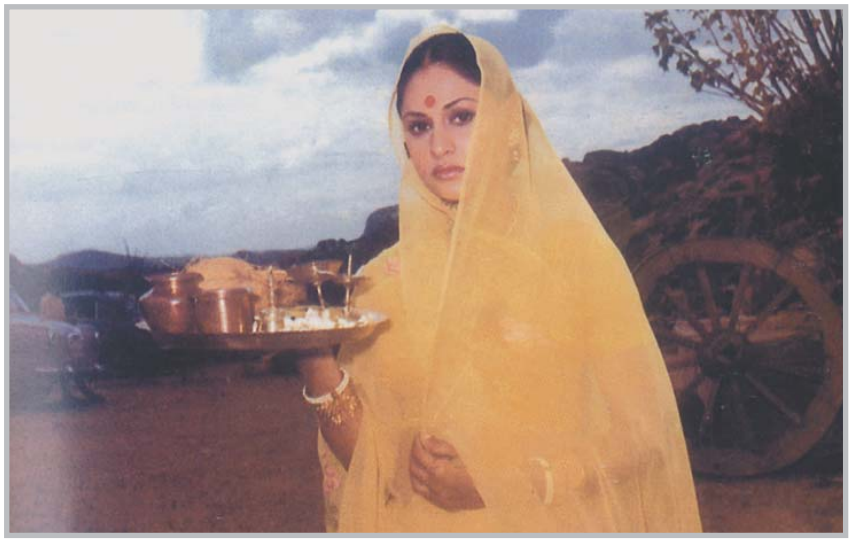

g»`‡ii c‡_ ivav Pwi‡Î Rqv fv`ox

শোলের ক্ষেত্রে এই ফরমেট অনুসরণ করা একটু জটিল হয়ে পড়লো। কেননা এই ফরমেটে ছবি বানাতে গেলে বিরাট ক্যামেরার প্রয়োজন পড়ে। প্রয়োজনীয় ক্যামেরা আমদানি করা বিরাট অর্থলগ্নির ব্যাপার। বাস্তব সমাধান হলো ৩৫ মিমিতে ছবি তৈরি করে ৭০ মিমিতে ব্লোআপ করা।

ক্যামেরাম্যান ক্যামেরার লেন্সের সামনে মাটিতে একটি কাঁচ স্থাপনের পরামর্শ দিলেন যাতে করে ৭০ মিমি ফ্রেমের মাপ ঠিক রাখার জন্য কাচে সীমানা চিহ্নিত করা যায়। রমেশ সিপ্পির ভাই অজিত থাকতেন লন্ডনে, তার মাধ্যমে প্যারিসে পাঠানো হলো ফিল্ম যেখানে ৭০ মিমি প্রিন্ট তৈরি হয়। প্রিন্ট ফেরত আসলো প্রয়োজনীয় কারিগরি নির্দেশনা সংযুক্ত হয়ে। ৭০ মি. মি. ছবির আরেকটা সীমাবদ্ধতা এই যে দেশের বেশির ভাগ প্রেক্ষাগৃহেই বড় পর্দা নেই,

অথচ বড় পর্দা ছাড়া ৭০ মিমি প্রিন্ট প্রদর্শন সম্ভব নয়। এরকম একটা অবস্থায় রমেশ ৭০ এবং ৩৫ দুটো ফর্ম্যাটেই ছবি নির্মাণের নির্দেশ ছিলেন। তার মানে দাঁড়ালো এই যে প্রতিটি দৃশ্য দু'দুবার করে শ্যুট করতে হলো।

বলাই বাহুল্য যে, ছবির খরচ অনেক বেড়ে গেল। এক কোটি টাকার বাজেট পরিকল্পিত হলো। প্রতিটি রাজ্যে সাড়ে বাইশ লাখ টাকায় প্রিন্ট বিক্রির জন্য ধার্য হলো। দিল্লি, পাঞ্জাব, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, কেরালায় সিপ্পির পক্ষ থেকে সরাসরি ছবি মুক্তি দেয়া হয়েছিল। বোম্বেতে তারা পরিবেশকের ভূমিকায় থাকলো।

ক্যামেরা টেকনিকে পারফেকশন আনার জন্যে রমেশ-দিবেকা জুটি কঠিন পরিশ্রম করতে লাগলো। সে-সময়েই অমিতাভ-জয়া বিয়ে করে ফেললো। প্রকাশ মেহরার 'জাঞ্জির'ও মুক্তি পেলো মে মাসে। হিট হলো আর অমিতাভও বড়ো তারকা বনে গেল।

যতোই তারকাখ্যাতি থাক, বান্ধবী নিয়ে প্রবাসে ছুটি কাটানোর ঘটনা কখনো ঘটেনি ইন্ডাস্ট্রিতে। অমিতাভ-জয়ার লন্ডন ভ্রমণ অমিতাভের রক্ষণশীল পরিবার সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলো না। বলা হলো আগে বিয়ে করে ফেলতে। প্রেমিকজুটি তৎক্ষণাৎ রাজি, ঠিক আছে কালই বিয়ে করবো। জয়া শোলেতে অভিনয় করছে। অমিতাভের দুর্ভাবনা হলো, বিয়ের কারণে জয়াকে বাদ দেয়া হয় কিনা ছবি থেকে। সে রমেশের সঙ্গে যোগাযোগ করলো। রমেশ তাকে আশ্বস্ত করায় অমিতাভ বললো, ঠিক আছে, তাহলে আমরা লন্ডনে হানিমুনে যাচ্ছি।

তিয়াত্তরের জুনে অমিতাভ-জয়া বিয়ে করলো। পুরোহিতকে দ্রুত বিয়ে পড়াতে বলা হলো, কারণ বিলম্ব হলে লন্ডনের ফ্লাইট তারা মিস করতে পারে। লন্ডন থেকে যখন ফিরে এলো নবদম্পতি তখন রমেশ পড়লো আরেক সমস্যায় এবং আলোচনায় বসতে হলো জয়ার সঙ্গে। কারণ মধুচন্দ্রিমা উদ্‌যাপনের সময়েই জয়া অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছিল।

আমজাদ নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকলো গাব্বার সিং চরিত্রে অভিনয়ের জন্য, তার ব্যক্তি জীবন পড়ে থাকলো পিছনে। জয়ার বাবা তরুণ কুমারের লেখা 'অভিশপ্ত চম্বল' বইটি মনোযোগ দিয়ে পড়তে থাকলো আমজাদ, সেখান থেকে ডাকু গাব্বার সিংয়ের অংশটুকু সে বারবার রপ্ত করতে লাগলো। ছেলেবেলায় এক ধোপা তার স্ত্রীকে ডাকতো 'আরে ও শান্তি'। সেই ভঙ্গিটি মনে ছিল আমজাদের। সেটাই উঠে আসলো গাব্বার সিংয়ের সংলাপে 'আরে ও শাম্বা'।

নিজের চরিত্র নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহী থাকলেও ভেতরে ভেতরে আমজাদ কিছুটা নিশ্চয়তার অভাবও বোধ করতো। স্ত্রীকে বারবার সে এ নিয়ে প্রশ্ন করতো- আমি ঠিক মতো পারবো তো। স্ত্রী তাকে আশ্বস্ত করতো নানাভাবে। স্ত্রী অবাক হয়ে দেখলো যে একদিন আমজাদ কোরআন শরিফ তেলাওয়াত করছে। আগে কখনোই যা করেনি। হঠাৎ যেমন তেলাওয়াত শুরু করেছিল, তেমনি হঠাৎ করেই পাঠ বন্ধ করে পবিত্রস্থানে কোরআন শরীফ রেখে স্ত্রী শায়লাকে বললো,

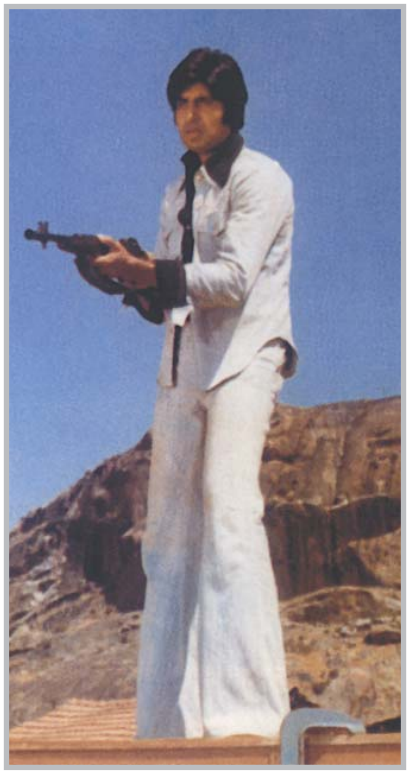

tkv‡j i UwRK wn‡iv AwgZvf

আমার মনে হয় আমি ঠিক পারবো। কথাগুলো বলেই আমজাদ বিমানবন্দরে দৌড় দিল ব্যাঙ্গালোরের প্লেনে চড়ে বসার জন্য। কিন্তু বিমানটি ব্যাঙ্গালোরে পৌছুতে পারেনি। কারিগরি ত্রুটির কারণে বিমানটিকে মুম্বাইয়ের আকাশেই ঘুরপাক খাওয়ান পাইলট। আকাশে জ্বালানি পুড়িয়ে বিমান মুম্বাইয়েই অবতরণ করলো। পাঁচ ঘন্টা পর কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দিল যে বিমানের কারিগরি ত্রুটি সারানো হয়েছে, এখন সেটি আকাশে ওড়ার জন্য প্রস্তুত। খুব বেশিজন যাত্রী ওই আহ্বানে সাড়া দিল না, যে পাঁচজনের ব্যাঙ্গালোর যাওয়া অত্যন্ত জরুরি ছিল এবং ওই প্লেনেই যারা শেষ পর্যন্ত উঠেছিল, তাদের ভেতর একজন ছিল এই আমজাদ খান। গাব্বার সিং সাজার জন্য সে ব্যাঙ্গালোর পৌছুতে পেরেছিল। আকাশে সে একবারও তার প্রিয় স্ত্রী বা সদ্যোজাত সন্তানের কথা মনে করেনি। বারবার শুধু একটি দুশ্চিন্তাই তাকে আঁকড়ে ধরছিল, সেটা হলো, যদি উড়োজাহাজ দুর্ঘটনার পতিত হয় তাহলে গাব্বার সিং হবে আমজাদ নয়, সেই ড্যানি!

শুটিংয়ের প্রথম পর্যায় : ঘটনার ঘনঘটা

দিনটা ১৯৭৩ সালের অক্টোবর। অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। ভারী বর্ষণে রাস্তা কর্দমাক্ত। আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। যেন গোধূলি পেরিয়ে সন্ধ্যা হচ্ছে। ফলাফল, কোনোভাবেই জেনারেটর এবং ক্যামেরা পাহাড়ের ওপর ঠাকুরের বাড়িতে উঠানো যাচ্ছিল না।

ওই দিন সকালবেলা রমেশ এক অদ্ভুত আবেগ নিয়ে বিছানা ছাড়লেন। তার মন ছিল বিরুদ্ধ ভাবনায় পরিপূর্ণ। তিনি ছিলেন উত্তেজিত, ভীত, উচ্চাভিলাষী, সন্ত্রস্ত, আত্মবিশ্বাসী, বিক্ষুব্ধ। অবশ্য তাকে দেখে বোঝা যাচ্ছিলো না। রমেশ খুব কম সময়ই তার আবেগ প্রকাশ করতেন। তাই দুপুর পর্যন্ত যখন বৃষ্টি থামলো না রমেশ ওই দিনের শুটিং বাতিল করে দিয়ে পরদিনের পরিকল্পনা করতে শুরু করলেন। তার মধ্যে একটি চিন্তাই ঘুরপাক খেতে লাগলো এটা কি কোনো অশুভ সংকেত?

ব্যাঙ্গালোরে তাদের শুটিং করতে যাওয়াটা রীতিমতো সেনাবাহিনীর একটা ব্যাটালিয়নের মতো; নির্দেশক, সিনেমাটোগ্রাফার, অভিনেতা, অভিনেত্রী, স্পট বয়, মেকআপম্যান, হেয়ার স্টাইলিস্ট, জেনারেটর, ক্যামেরা এবং এদের রক্ষণাবেক্ষণকারী, ঘোড়া এবং ঘোড়সাওয়ারী, নির্মাণ কুশীলব, ড্রেস ম্যান, বাবুর্চি, ফাইটার এবং নৃত্যশিল্পী- এই নিয়ে পুরো দল। প্রথম সারির কুশীলবরা অবস্থান নিলেন নতুন প্রতিষ্ঠিত অশোকা হোটেলে। পুরো হোটেলের এপাশ-ওপাশ ছিলো তাদের দখলে। প্রত্যেক তারকাকে ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়েছিল হোটেলে একটি পূর্ণাঙ্গ কক্ষ এবং একটি করে গাড়ি। আমজাদ এবং সঞ্জীবের মতো তারকারা ছিলেন 'হোটেল ব্যাঙ্গালোর ইন্টারন্যাশনালে।' এছাড়া লাইট ও প্রোডাকশনের কয়েকজন ছিলেন তৃতীয় আরেকটি হোটেল। শুটিং লোকেশন ছিল হোটেল থেকে প্রায় এক ঘন্টার 'গাড়ি পথ'। সবার আগে সকাল ৬টায় হোটেল ছাড়তেন রমেশ ও দিবেকা। তারপর প্রায় ১৫০ জনের একটা ইউনিট শুটিং লোকেশন রামানগরাম-এর দিকে প্রতিদিন যাত্রা করতো। রমেশ সিপ্পির প্রোডাকশনের এই বহর দেখে একে হলিউডের কোনো শুটিং ইউনিট বলে ভুল করা যেতে পারে।

প্রতিদিন বিকেলে কুশীলবরা তাদের পরবর্তী দিনের করণীয় কী তার একটি বিশদ তালিকা পেয়ে যেতেন। তাতে উল্লেখ থাকতো রিপোর্টিংয়ের সময়, লোকেশনের নাম, শট নাম্বার, পোশাকের বিবরণী, যে গাড়িতে লোকেশনে আসবে তার নাম্বার এবং গাড়িটির হোটেল ছাড়ার সময়। তালিকা করা হতো তারকাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করেই। সঞ্জীব দেরিতে ঘুম থেকে জাগতো বলে তার শিডিউল সব সময় দুপুর বা বিকেলের দিকে দেয়া হতো। আর প্রত্যেক গাড়ির ড্রাইভারদের কড়া নির্দেশ দেয়া ছিল; গাড়ি হোটেল ছাড়ার পর লোকেশনে পৌছার আগে রাস্তায় কোথাও থামবে না।

অক্টোবরের তিন তারিখ ছিল কাজের প্রথম দিন। 'শোলে'র প্রথম শট ছিল অনুতপ্ত অমিতাভ জয়ার হাতে নিরাপদে চাবি তুলে দেয়। সেই সময় জয়া ছিলেন তিন মাসের গর্ভবতী। এই সময় জয়া অমিতাভের গাড়ি চড়ে রামানাগারামের মতো পাহাড়ি এলাকায় 'শট' দিতে আসতেন। অভিতাভ অবশ্য 'শোলে'র লোকেশন নির্বাচন সঠিক ভাবতেন না।

আরেক অভিনেত্রী হেমা মালিনী সংলাপগুলো কিছুতেই আত্মস্থ করতে পারছিলেন না। 'ইয়ে ইতনে লাম্বা লাম্বা ডায়ালগ কোন বোলেগা? (এত

বড় বড় সংলাপ কে বলবে?) এর কিছু অবশ্যই কেটে বাদ দিতে হবে। বাসন্তীর এমন আবদার স্ক্রিপ্ট রাইটার জাভেদ শেষ পর্যন্ত রেখেছিলেন।

শুটিং সাধারণত সকাল সাতটায় শুরু হতো এবং সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত চলতো। জয়ার মতে, শুটিংটা ছিলো দারুণ উপভোগ্য, যেনো পিকনিক। জয়া বলতেন, আমাদের চিন্তাভাবনা অনেকটা এমন ছিলো 'কে হোটেলে ফিরতে চায়? রাতটা কি সেটেই কাটিয়ে দেয়া যায় না?' এমনকি যেসব শিল্পী নির্দিষ্ট কোনো দিনের শুটিংহীন থাকতো তারাও লোকেশনে চলে আসতো। শট দেয়ার আগে যখন দীর্ঘ বিরতি থাকতো তখন তারা 'রুমি' খেলায় মেতে উঠতো প্রতি পয়েন্টের জন্য এক পয়সা বাজি রেখে। আর পরিশ্রান্ত হয়ে গেলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মেকআপ রুমে বসে বিশ্রাম নিতো। আর এই সময় তারা খেতো মুম্বাই থেকে আনা বাহাদুর বাবুর্চির অসাধারণ রান্নায় সুস্বাদু সব খাবার।

সারা দিনের ভীষণ খাটুনির পর রমেশ এবং দিবেকা সোজা অশোকা বারে চলে যেতেন। রমেশ পানি এবং বরফের সঙ্গে নিতেন ছোট একটা হুইস্কি। অন্যদিকে দিবেকা নিতো বড় পেগ। বার থেকে বের হয়ে রমেশ এক গোসলে সারা দিনের ক্লান্তি ধুয়ে ফেলতেন। তারপর স্যুপ আর টোস্ট দিয়ে রাতের খাবার সারতেন।

রমেশ এবং দিবেকার সংযোগ ও সমন্বয়টা ছিলো অসাধারণ, যদিও উভয়ের মধ্যে ছিলো বয়সের বিস্তর ব্যবধান। দিবেকা ছিলেন পঞ্চান্নো আর রমেশ ঊনত্রিশ। রমেশ তাকে 'দেব সাব' বলে ডাকতেন, দিবেকা উত্তর দিতেন 'রমেশজি' বলে। তারা প্রত্যেক তারকাকে নতুন নাম দিয়েছিলেন- ধর্মেন্দ্র হয়ে গেলেন ধামু। অমিতাভ হলেন অ্যামি আর সঞ্জীব ধুভেন্দু। কিন্তু শট নেয়ার সময় রমেশ কখনোই স্টারদের নাম ধরে ডাকতেন না। একটা হর্ন বাজানো হতো। শব্দ শুনে পাত্রপাত্রীরা চলে আসতেন।

প্রতিটি দিন শেষ হতো পরের দিনের অনুপুঙ্খ পরিকল্পনা করে। প্রথম শিডিউলের দশ দিন কেটে যাবার পরও কাজ এগিয়ে ছিল খুবই কম। কোনো কোনো দিন মাত্র দশটা শট ঠিকঠাকভাবে নেয়া যেতো। নবেম্বরের শিডিউলে মাত্র একটা দৃশ্য ধারণ করা গেলো।

শোলের কেন্দ্রীয় অংশ, যে দৃশ্যে গাব্বার ঠাকুর পরিবারকে ধ্বংস করে দেয়, ধারণ করতে তিনটি শিডিউলে মোট তেইশ দিন লেগেছিলো। দৃশ্যটি অনেকগুলো জটিল অংশের সমন্বয়ে গঠিত- ঠাকুর পরিবারের স্বরূপ উন্মোচন, গাব্বারের আগমন, সংঘর্ষ, তারপর ঠাকুর পরিবারের সদস্যদের হত্যার পর ঠাকুরের গাব্বারের কাছে আসা এবং ঠাকুরের পরিণতি বরণ। এর অর্ধেক দৃশ্য ধারণ করার পর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায়। দুই দিন পুরো ইউনিট সূর্যের জন্য অপেক্ষা করে বসে ছিল। এক সময় রমেশের মনে হলো অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এক স্বর্গীয় সংকেত, এই মেঘাচ্ছন্ন পরিবেশই এই দৃশ্যের জন্য সঠিক। এর মধ্য দিয়ে ট্র্যাজেডি এবং নিয়তিকে তুলে ধরা যায় সুস্পষ্টভাবে।

মৃত্যুদেহের ওপর শুকনো পাতা উড়ে যাওয়ার দুটো দৃশ্য নেয়া হলো। একটি উজ্জ্বল আলোয়, অন্যটি মেঘাচ্ছন্ন পরিবেশে। আকাশের লুকোচুরি খেলায় কাজের গতি হয়ে পড়েছিল শ্লথ। পুরো কাজে গতি আনার জন্য দিবেকা আনোয়ারকে 'লাইট বাউন্স' রোধ করে দ্রুত কাজ করার জন্য একটা পর্দা তৈরি করতে বললেন। আনোয়ার আশপাশের এলাকায় যত সাদা কাপড় পেলেন সব কিনে ৭০ ফুট বাই ১০০ ফুটের একটা পর্দা তৈরি করলেন। তিনি নিজে শক্ত মোটা সুতা দিয়ে পর্দাটা সেলাই করলেন। এসব সুতা সাধারণত ক্যানভাস সেলাই করতে ব্যবহার করা হয়। পর্দা ব্যবহার করে শুটিংয়ের কাজ বেশ দ্রুত এগুলেও মনমতো হচ্ছিলো না। তার পরও কাজ চলছিল। তারা যখন দৃশ্যটি প্রায় শেষ করে এনেছে এমন সময় ঠাকুরের নাতির চরিত্র রূপদানকারী মাস্টার অলঙ্কারের পরীক্ষা চলে এলো। সে যদি এই বার্ষিক পরীক্ষা না দেয় তবে তার প্রাতিষ্ঠানিক

evmšxi gb †fvjv‡Z e¨ fxi“

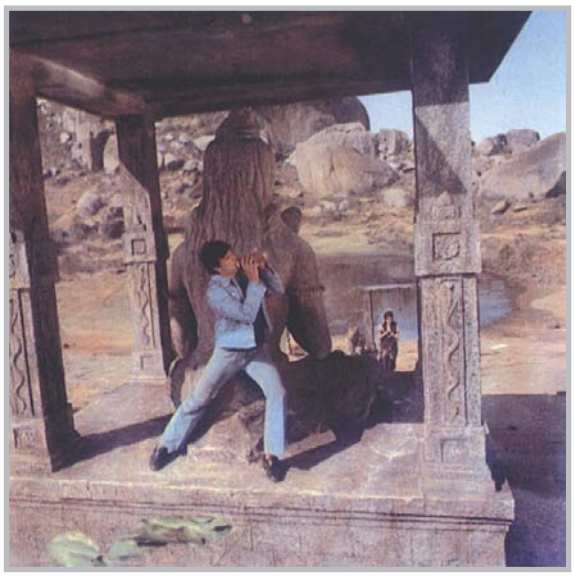

শিক্ষার এক বছর নষ্ট হয়ে যাবে। নির্দেশক রমেশ তাকে যেতে দিলেন। তারপর ঝামেলা পাকালো প্রপেলারটা। যেটার বাতাস দিয়ে পাতা ওড়ানো হবে মরদেহগুলোর উপর দিয়ে। কিন্তু সময়মতো এটা চালু হলো না। আবার যখন এটা চালু হয় তখন আবার বন্ধ হয় না। শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্গালোরের কাছে বিমানবাহিনীর লোকজন, তাদেরকে নতুন একটি প্রপেলার তৈরি করে দিল।

একই রকম অতিরিক্ত সময় নিয়েছিলো- রাধার সন্ধ্যাবাতি জ্বালানো আর জয়-এর হারমোনিয়ামটা বাজাতে বাজাতে নিচে বসে তা দেখার দৃশ্যটি। এই দৃশ্যটি একজন বিধবা এবং একজন তস্করের নিঃশব্দে এক অসাধারণ সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচন করে। এই সহমর্মিতা এবং আকর্ষণ ধীরে ধীরে ভালোবাসায় রূপ নেয়। কিন্তু সঠিক অভিব্যক্তিটি ধারণ করা ছিল বেশ কষ্টকর। অথচ চূড়ান্ত ফিল্মে এখন থেকে মাত্র মিনিটখানেক করে দুটো সিকোয়েন্স নেয়া হয়েছিলো। অথচ এই দৃশ্যগুলো চিত্রায়িত করতে প্রায় বিশ দিন সময় লেগেছিল। রমেশ এবং দিবেকা চিন্তা করল তারা দৃশ্যটি ধারণ করবে, 'ম্যাজিক আওয়ারে'। এই শব্দবন্ধটি একটি চলচ্চিত্রগত শব্দবন্ধ, এখানে সূর্যাস্ত এবং রাত শুরুর মাঝখানের সময়টির কথা বলা হয়েছে। দুপুরের খাবারের পর থেকে দৃশ্য চিত্রায়ণের প্রস্তুতি নেয়া শুরু হয়। সময়ের আগে লাইট এবং ক্যামেরা জায়গামতো বসানো হয়। বিকেল পাঁচটা নাগাদ তারা অভিনয় এবং ক্যামেরার মুভমেন্টের অনুশীলন করে নেয়। তারপর যখন ৬টা থেকে সাড়ে ৬টার মধ্যে সূর্য অস্ত যেতে শুরু করে চারদিকে একটা হট্টগোল পড়ে যায়। সবাই রাত হয়ে যাবার আগে আগে শটটি শেষ করবার জন্য ছোটাছুটি করতে থাকে। মাঝে মাঝে তারা একটি 'শট' ধারণ করতে পারে, তবে কখনো কখনো দুটি শটও নেয়া হয়। কিন্তু তারা কখনোই পুরো আয়োজন পরিবর্তন করেনি। কেননা রমেশ কাজটি নিখুঁত না করে কখনোই শান্ত হতেন না। আর সব সময়ই কোনো না কোনো ঝামেলা হতোই। হয়তো সূর্য সবাইকে আশাহত করে আগেই ডুবে যেতো, হয়তো লাইটম্যান একটা ভুল করে বসলো। ট্রলির মুভমেন্টটা ঠিকমতো হলো না। কিছু জিনিস হয়তো পড়ে আছে ফ্রেমের ভেতর কোথাও, যেটা সে জায়গায় থাকার কথা ছিলো না। একবার জয়া রেগে বলে উঠলেন- 'রমেশ, এই অন্ধকারে পৃথিবীর কেউ আমাদের ধারাবাহিকতার খুঁত ধরতে পারবে না। আর রমেশ উত্তর দিত- 'না, না, আরো একটা শট।' দৃশ্যটি সঠিকভাব চিত্রায়ণ করতে বেশ কিছু শিডিউল লেগে গেল। একেকটা দৃশ্য এতটা সময় নিচ্ছে ধারণ করার জন্য, মনে হয় যেন একটা দৃশ্য আরেকটা দৃশ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মেতেছে। অন্ধ ইমামের সন্তান আহমেদের (শচীন চরিত্রটি রূপদান করেছিলো) মৃত্যুর দৃশ্যটি নিতে সতেরো দিন লেগেছিল। দৃশ্যটি ছিল বড় এবং জটিল। দৃশ্যটির জন্য অনেক কিছুই চিত্রায়িত করা হয়েছিল কিন্তু মূল ছবিতে রাখা হয়েছিল শুধু গাব্বার একটা পিঁপড়া টিপে মারছে, অন্যদিকে ঘোড়ায় বাঁধা আহমেদের লাশ গ্রামে পৌঁছে গেল। মৃত লাশটি ছিল গ্রামবাসীদের জন্য একটি বার্তা, তারা যেন জয় এবং বীরুকে তার হাতে তুলে দেয়। গ্রামবাসীরা চাইলো তারা যেন চলে যায়। শুধু ইমাম সাহেব চাইলো তারা যেন থেকে যায় এবং তিনি কাঁদতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন, 'জানতে হুঁ দুনিয়্যা কা সাবচে বাড়া বোঝা ক্যাঁয়া হোতা হ্যায়? বাপ কী কান্দো পার বেটাকা জানাযা... আজ পুছুগা আপনা খোদা সে কী মুঝে আওর ব্যাটা কিঁউ নেহি দিয়া শাহ্যাদ হুঁনে কী লীয়ে।' (তোমরা কি জানো যে পৃথিবীতে সবচেয়ে ভারী বোঝা কী? সেটা হলো পিতার

কাঁধে পুত্রের লাশ। আল্লা কেন আমাকে আরো ছেলে দেয়নি শহীদ হওয়ার জন্যে?) দৃশ্যটি ছিল মনে রাখার মতো। নাটকীয়তা এবং স্বদেশপ্রেমে ভরপুর। ঘোড়ায় করে আহমেদের লাশ প্রত্যাবর্তনের দৃশ্যটি ধারণের জন্য রমেশ শচীনের নকল কাউকে দিয়ে স্টান্ট করানোর সিদ্ধান্ত নিলো, কিন্তু শচীন নিজেই দৃশ্যটিতে অভিনয় করতে আগ্রহ প্রকাশ করলো। দৃশ্যে বীরু এবং জয় লাশটি নিয়ে মাটিতে শুইয়ে রাখে। দৃশ্যটি ধারণের ঠিক আগ মুহূর্তে অমিতাভ শচীনকে বললো সে যেন তার শরীরকে শক্ত করে রাখে। শিথিল, নরম শরীর বহন করার জন্য কষ্টকর। শচীন অমিতাভের কথায় মাথা নেড়ে সায় জানালো। 'শট' নেয়ার পর শচীনের দারুণ পেশাদারি অভিনয় দেখে অমিতাভ বিস্ময়াভিভূত হয়ে জানতে চাইলো, 'তুমি মোট কতগুলো সিনেমায় অভিনয় করেছো?'

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে শচীন উত্তর দিলো 'প্রায় ষাটটি।' অমিতাভের চোয়াল ঝুলে পড়লো, সে আবার জিজ্ঞেস করলো- 'কত দিন ধরে তুমি কাজ করছো?'

শচীন উত্তর দিলো, '১৯৬২ থেকে।'

একদিন হঠাৎ চারজন ছাত্র পাশের এলাকা থেকে এসে শুটিং বন্ধ করতে বললো এবং 'সেট' পুড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিল। তারা ৫০ হাজার রুপি চাঁদা দাবি করলো। রমেশ এই পরিমাণ টাকা দিতে অস্বীকার করলো এবং বললো- 'ইচ্ছে হলে সেট পুড়িয়ে ফেল, আমি কাজ বন্ধ করবো না।' রমেশের কঠোরতা দেখে তারা ২০ হাজার রুপি দিলেই হবে বলে জানালো। রমেশ তার জায়গায় অনড়। তারা দশ-এ নেমে এলো। তারপর কারোই বুঝতে বাকি রইলো না এইসব ছাত্ররা এ ধরনের ব্যাপারে নতুন। পুলিশ কমিশনারকে ঘটনাটা জানানো হলো। পুলিশ তাদের ধরে জেলে নিয়ে গেলো। দু'দিন পর তাদের পিতা-মাতারা রমেশের কাছে কান্নাকাটি করে, ক্ষমা চেয়ে ছেলেদের ছাড়িয়ে নিয়ে গেলো।

রমেশ গাব্বার চরিত্রের জন্য আলোচনা করতে লাগলো, তাকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেবার চেষ্টা করলো। তারা দু'দিন ধরে চল্লিশটা বাজে 'শট' ধারণ করার পর রমেশ এবং দিবেকা দু'জনই সিদ্ধান্তে উপনীত হল আমজাদের বিশ্রাম প্রয়োজন। দিবেকা আমজাদকে পরামর্শ দিলো সে যেন গাব্বারের পোশাক পরে সেটে বসে থাকে। সে রাতে আমজাদ কাঁদলো। তার বাবা হাসপাতালে ক্যান্সারের সাথে মৃত্যুপাঞ্জা লড়ছেন। বাড়িতে এক মাস বয়সী পুত্র সন্তান। তার পুরো পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে এই সিনেমাটি। পরের শিডিউলে আমজাদ আরো বেশি প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলো। এইবার অল্প কয়েকবারেই সঠিকভাবে দৃশ্যটি ধারণ করা গেল। সে তার চরিত্রের মধ্যে বসবাস করতে শুরু করলো। তার যখন শুটিং থাকতো না তখনো সে পোশাক পরে সেটে বসে থাকতো। কিন্তু ইউনিটের কাছে আমজাদের এই অভিনয় যথেষ্ট ভালো বলে মনে হলো না। তাছাড়া একঝাঁক তারকার মধ্যে আমজাদ একদমই নতুন। ইউনিটে কানাঘুষা শুরু হয়ে গেলো 'তবে কী

†kv‡ji cwiPvjK i‡gk wmwà I wPÎMvnK w`‡eKv

রমেশ ভুল করছে। আমজাদকে গাব্বার চরিত্রে নেয়া ঠিক হয়নি।' ব্যাপারটা এমন পার্যায়ে পৌঁছলো যে সেলিম এবং জাভেদও এ রকমই ভাবতে শুরু করলো। যদিও তারাই আমজাদকে গাব্বার হিসেবে ছবিতে নেয়ার জন্য রমেশকে অনুরোধ করেছিলো। তারা রমেশের সাথে এই বিষয়টি নিয়ে কথা বললো, 'যদি তুমি আমজাদকে নিয়ে সন্তুষ্ট না হও তবে অভিনেতা বদলাতে পারো।' কিন্তু রমেশের এক কথা, শুধুমাত্র আমজাদই গাব্বার চরিত্রটি পারবে।

অনেক পরে আমজাদ গুজবটি শুনতে পেলো কিন্তু সে সেলিম-জাভেদকে ভুল বুঝলো। সে কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পেলো না কেনই বা এই দু'জন তাকে এই চরিত্রে নেবার জন্য সুপারিশ করেছে আর এখন কেনই বা এখন তারা তা চাইছে না। সে ধরে নিলো এটা তার কেরিয়ার নিয়ে একটা ষড়যন্ত্র। আমজাদ হৃদয়ে বড় আঘাত পেলো। শোলে-র পরে আর কখনোই এই দু'জনের সঙ্গে কাজ করেনি।

১৯৭৫-এর অক্টোবর থেকে ১৯৭৬-এর মে পর্যন্ত শোলে ইউনিটের প্রতিমাসে ১০ থেকে ১৫-এর শিডিউল থাকতো। প্রতিবারই তারা কিছু কাজ উঠিয়ে নিতে পারতো কিন্তু তা যথেষ্ট ছিলো না। সাত মাস কাজ করার পর ছবিটির মাত্র এক-তৃতীয়াংশ শেষ হয়েছিলো, যদিও পুরো প্রজেক্টটির মেয়াদ ঠিক করা হয়েছিলো ছ'মাস। সত্যিকার অর্থে কেউ ভাবতে পারেনি এতো সময় লেগে যাবে। ম্যাকমোহন ছবির খুব ছোট্ট একটি চরিত্রে রূপদান করার জন্য মোট সাতাশবার মুম্বাই থেকে ব্যাঙ্গালোর এসেছিলো। যাই হোক, রমেশ মাথা ঠান্ডা রাখলো। সিপ্পি বড় একটি দাও মারার জন্য জুয়া খেলতে শুরু করলো। সে টাকা পাঠিয়ে দিলো।

মার্চে জয়ার সন্তান জন্মগ্রহণ করলো, '৭৪-এর মে'তে আবার সবাই রামানাগারাম এলো। জয়ার চেহারায় মাতৃত্বের যে ছাপ ফুটে উঠেছিলো তাতে করে বিধবার চরিত্রে তাকে মানাচ্ছিলো না। এরপর রমেশ একটা বড় সিদ্ধান্ত নিলো। ইউনিটের সবাইকে ডাকা হলো। তারপর রমেশ বলতে লাগলো, 'দেখুন, এখন পর্যন্ত এখানে অনেক কিছুতেই ঝামেলা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জয়ার জন্য হলেও আসলে সবকিছুর জন্য এইবারের শিডিউল বাতিল করে দিচ্ছি। আপনারা আপনাদের সচিবদের সঙ্গে কথা বলে তারিখগুলো ঠিক করে নিন। কেননা এরপর আমরা যখন ব্যাঙ্গালোরে আসবো ছবির কাজ শেষ না করে ফিরে যাবো না। তাতে এক দুই বা তিন মাস যত সময়ই লাগুক না কেন? সবাই রমেশের কথায় সায় জানালো। শিডিউল বাতিল হয়ে গেল। কেউ কেউ ছুটি কাটাতে চলে গেলো। ১৯৭৪-এর সেপ্টেম্বরের আগে আর শোলের শুটিং শুরু হলো না। তারকাদের শিডিউল পুনরায় মিলিয়ে আবার শোলের ইউনিট রওনা দিল রামানাগারামের উদ্দেশ্যে, সেপ্টেম্বরের শেষে।

ছবির গানের নেপথ্যে কিছু ব্যক্তিগত সঙ্গীত

ছবির অন্যান্য অংশের চিত্রায়ণের মতো গানগুলোর দৃশ্যায়নও কঠিন ছিলো। 'ইয়ে দোস্তি' শিরোনামের গানটি চিত্রায়িত করতে একুশদিন সময় লেগেছিলো। গানটির মধ্য দিয়ে বীরু এবং জয়ের বন্ধুত্বের স্বরূপ উন্মোচিত হয়। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো যে গানটি মোটর সাইকেলের ওপর চিত্রায়িত হবে। কিন্তু পুরো গানটি একটি চলন্ত যানে চিত্রায়ণ করা বেশ কঠিন। সুতরাং তারা বিশেষ কিছু 'ক্যামেরা মুভমেন্ট' চিন্তা করলো। দিবেকা প্রথমে একজনের 'টাইট ক্লোজ আপ' নিয়ে শুরু করলো, এবং দু'জনকেই ফ্রেমে রেখে পিছিয়ে আসতে থাকলো এবং তারপর প্রায় ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে অন্যপাশে চলে গেল। এমন 'ক্যামেরা মুভমেন্টের' ফলে দর্শকের মনে হবে তারা বীরু ও জয়ের সাথে মোটর সাইকেলটিতে ভ্রমণ করছে। ক্যামেরা ছিল ট্রলির ওপরে স্থির আর মোটর সাইকেল চলন্ত। এমন একটি অবস্থায় দৃশ্যটা বিশ্বাসযোগ্য করা বেশ কঠিন। তার ওপর মোটর সাইকেলে সাইডকার ভাঙার দৃশ্য আছে, সেটা জোড়া লাগানোও হবে আরেক শটে। মোটর চালকের মুন্সিয়ানার ওপর বিষয়টা অনেকখানি নির্ভরশীল। অমিতাভ সেটা ভালোভাবেই পারলো। স্পটের দর্শকরা উল্লসিত, ক্যামেরার পেছন থেকে রমেশও ছুটে এসে অমিতাভকে খুশিতে জড়িয়ে ধরলেন।

'কোই হাসিনা' গানটির জন্য প্রয়োজন ছিল ভিন্ন কিছুর। বাসন্তী তার টাঙ্গা (ঘোড়ার গাড়ি) নিয়ে যাচ্ছে। তার পেছন পেছন বীরু বাই সাইকেলে যেতে যেতে বাসন্তীর মান ভাঙানোর চেষ্টা করছে। এমন সময় পেছন থেকে ট্রেনের শব্দ ভেসে আসবে। গানের চরণের দাবি অনুযায়ী একটা ট্রেন ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলে যাচ্ছে, এমন দৃশ্যের প্রয়োজন হলো। ক্যামেরাকে টাঙ্গা, সাইকেল এবং ট্রেনকে অনুসরণ করতে হচ্ছিলো।

চলন্ত টাঙ্গায় হেমা, পিছনে একবার সাইকেল নিয়ে আরেকবার দৌড়ে তার মান ভাঙানোর

চেষ্টায় রত ধর্মেন্দ্র। দূরে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ট্রেন চলে যাচ্ছে। 'কোই হাসিনা' গানটির চিত্রায়ণ বেশ কঠিন। ট্রেন ঠিক ৭টা ৫০ মিনিটে সেখান দিয়ে পাস করবে। সবাই টেকের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু দৃশ্যের ধারাবাহিকতায় দেখা গেলো হেমার মাথায় ফুল নেই, অথচ আগের শটে ফুল ছিল। ধারাবাহিকতার দায়িত্বে যিনি ছিলেন তার তো হার্ট অ্যাটাক হওয়ার যোগাড়। রমেশ রেগে টং। গাড়ি গেছে খাবার আনতে। ট্রেন যাওয়ার ঠিক সাত মিনিট আগে গাড়ি এলো ফুল নিয়ে, দ্রুত সেটা হেমার (বাসন্তী চরিত্র) চুলে গোঁজা হলো। শট প্রস্তুত। ট্রেনও এলো সময় মতো। ব্যস, হয়ে গেলে কাজ। সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

হোলি খেলার গানটির চিত্রায়ণের জন্যে মেলার পরিবেশ তৈরি জরুরি ছিল। প্রচুর জুনিয়র শিল্পী এই দৃশ্যে অভিনয় করেন। এই গানটির চিত্রায়ণ করতেই লেগে গিয়েছিল পাক্কা কুড়িটি দিন।

'যাব তাক হ্যায় জান' গানটির চিত্রায়ণ হয়েছিল গাব্বারের আস্তানায়। সাম্বা বীরুর ওপর বন্দুক তাক করে আছে। আর গাব্বার বাসন্তীকে আদেশ দিলো 'যাব তাক তেরি পাও চালে উসকি শ্বাস চালেগি, যাব তেরি পাও রুকী তো ইয়ে বান্দুক চালেগি। (যতক্ষণ পা চলবে ততক্ষণ তোমার প্রেমিকের শ্বাস চলবে। নাচ বন্ধ তো ওর শ্বাসও বন্ধ করে দেয়া হবে।) গানটির চিত্রায়ণ হলো মে মাসের রোদ্দুরে। হেমা মালিনী চেয়েছিল গানটি অন্য কোনো সময়ে চিত্রায়িত হোক। কিন্তু রমেশ চাইছিল বাসন্তীর (হেমা) চূড়ান্ত কষ্টের অভিব্যক্তি। তাই রোদের মধ্যেই করতে হবে। কিন্তু সে সময় রাতে বৃষ্টি হওয়ায় সমস্যা হলো। কয়েকদিন দেরি হলো স্পট শুটিং উপযোগী করতে। হেমা উচ্চাঙ্গনৃত্যের তালিমপ্রাপ্ত ছিল তাই নাচের দৃশ্যে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু গাব্বার সিংয়ের সহযোগী সাম্বা বোতল ছুঁড়ে মারলে তার টুকরোর ওপর দিয়ে নাচা খুবই কষ্টের। রোদের জন্য পা পুড়ে গেলে পানি নিয়ে তৈরি আছে ইউনিট বয়। কিন্তু পা কেঁটে গেলে? অবশ্য প্লাস্টিকের কাচই ব্যবহৃত হয়েছিল। হেমার পায়ে আগে থেকেই ফোসকা পড়ে গিয়েছিল। আর সত্যি সত্যিই যখন কাচের বোতল ভাঙা হলো, তার টুকরো গিয়ে বিঁধলো তার পায়ে। কিন্তু হেমার নাচ থামেনি, সে তার সেরা পারফরমেন্সেরই চেষ্টা চালাতে লাগলো। এক ক্লাইমেক্সের দৃশ্যে গাব্বার বাসন্তীর বাহু ধরে সংলাপ বললো, 'দেখো ছামিয়া, য্যায়দা নাখার মত করো হামসে, নেহী তো ইয়ে গোরি চামড়ি হ্যায় না- সারা বদনছে খুড়াচ খুড়াচ কে উতার দোংগী।' আমজাদ এতোটাই চরিত্রের মধ্যে ডুবে ছিলো যে সে একটু শক্তভাবেই হেমার বাহু ধরেছিলো। ফলে বিকেল নাগাদ হেমার হাত ফুলে গেল এবং ব্যথা করতে লাগলো। রাতে খাবার টেবিলে ধর্মেন্দ্র এ নিয়ে রাগ প্রকাশ করলো। ধর্মেন্দ্র সেই সময় হেমা মালিনীকে ভালোবাসতো। তার এই আকর্ষণ শুরু হয়েছিলো 'সীতা আওর গীতা' ছবিতে আর এই সময়ে এসে তা বেশ জোরালো হয়েছে। তারা দু'জনই অল্প বয়স্ক, দেখতে সুন্দর এবং নিজেদের কেরিয়ারের শিখরে ছিলেন, ফলে এ রকম হওয়াটাই ছিলো স্বাভাবিক, অন্যান্য প্রেমের গল্পের মতো এখানেও জটিলতা ছিল। ধর্মেন্দ্র ছিলেন বিবাহিত এবং তার সন্তানও ছিলো। অন্যদিকে হেমা- ধর্মেন্দ্রর ব্যাপারটা হেমার মা মেনে নিতে পারেননি। অন্যদিকে অবিবাহিত সঞ্জীব কুমারও 'সীতা আওর গীতা' ছবির সেটে হেমাকে তার ভালোবাসার কথা জানিয়েছেন, কিন্তু হেমা তাকে 'না' বলে দিয়েছে। তারপরও আশা ছাড়েননি সঞ্জীব। এই ত্রিভুজ প্রেমের নাটক 'শোলে'র সেটেও দেখা গিয়েছিলো। হেমা ছিলেন পেশাদারি মনোভাবাপন্ন ফলে তার তেমন কোনো সমস্যা হয়নি সঞ্জীবের সাথে কাজ করতে। কিন্তু ধর্মেন্দ্র ছিলেন প্রেমের ক্রীতদাস। যখন হেমা ও তার প্রেমের দৃশ্যগুলোর শুটিং হতো সে ভুল করার জন্য লাইটবয়দের টাকা দিতো। যেন সে বারবার হেমাকে বিরক্ত করতে পারে। ঘনিষ্ঠ হতে পারে। ধর্মেন্দ্র এবং লাইটবয়রা নিজেদের মধ্যে একটা সংকেতিক ভাষা তৈরি করে নিয়েছিলো। যখন ধর্মেন্দ্র কান চুলকাতো তখন লাইট বয়রা ভুল করতো ফলে শট আবার রিটেক করতে হতো। ধর্মেন্দ্র যখন নাক চুলকাতো, লাইট বয়রা কোনো ভুল করতো না, ফলে শটটি সঠিকভাবে নেয়া যেতো। লাইটবয়রা এ রকম প্রতি 'রিটেকে'র জন্য ধর্মেন্দ্রর কাছ থেকে একশ' রুপি করে নিতো। এমন করে কোনো কোনো দিন লাইট বয়রা দু'হাজার রুপি পর্যন্ত উপার্জন করতো।

ধর্মেন্দ্র রমেশকে বললো, যেন হেমার কাছে তার সম্পর্কে ভালো ভালো কথা বলে, সে যেন এও বলে ধর্মেন্দ্র হেমাকে বিয়ে করতে চায়। হেমা আবার রমেশকে খুব বিশ্বাস করতো। যার ফলে এক সময় হেমা ধর্মেন্দ্রর ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠতে থাকে।

'মেহবুবা ও মেহবুবা' গানটি নিয়ে গোল বাধলো। গরম গরম তর্ক হয়ে গেল জাভেদ আর রমেশের মধ্যে। জাভেদ গানটি পছন্দ করলেও প্রস্তাব দিলো ধর্মেন্দ্র-হেমাকে দিয়ে দৃশ্যটি করাতে। রমেশ ভেবে রেখেছে গাব্বার সিংয়ের আস্তানার জন্যে। সেখানে জিপসি নাচ হবে। স্বল্প বসনা হেলেনকে কামার্ত চোখ দিয়ে দেখছে গাব্বার সিং। জাভেদের এক কথা, এটা বেশি ফিল্মি আর গাব্বারের চরিত্রের সঙ্গেও যায় না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেক্সি হেলেনই অভিনয় করলো গানটিতে। বলাই বাহুল্য, নাচ-গান সবই হিট হলো।

১৯৭৪-এর জানুয়ারির শেষ দিকে 'শোলে' ইউনিট রামানাগারামকে বিদায় জানালো। এটা অনেকটা তাদের দ্বিতীয় বাড়িতে পরিণত হয়েছিলো। তারা এখানে এতোটাই সময় কাটিয়েছিলো যে মাহবুব নামের এক লাইটম্যান রামানাগারামের এক মেয়েকে বিয়ে করে ফেললো। শোলের শেষ দৃশ্যে জয় মারা যায়। দৃশ্যটি গ্রামের ভিতরে ধারণ করা হয়। এই দৃশ্যটি ছিল ভীষণ মর্মস্পর্শী। দৃশ্যের শেষ দিকে রাধা ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং এক সময় তার কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ে। শুটিং যখন চলছিলো তখন হারি ভাই রমেশের কাছে এসে রাধার শ্বশুর ঠাকুরের জবানিতে করুণ কণ্ঠে বলতে থাকে, 'আমি রাধার চোখ দেখতে পাচ্ছি, তাকে পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত মনে হচ্ছে, সে আমার ছেলেকে বিয়ে করেছিলো... এবং আমি তারপর তাকে জয়ের সাথে বিয়ে বসতে দেইনি। যার কারণে এই ট্র্যাজেডিটি ঘটলো, আমি তার জন্য খুবই দুঃখিত... আমি কি তাকে আমার বাহুতে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে পারি?' রমেশ তার দিকে তাকিয়ে মৃত্যুশীতল গলায় জানতে চাইলো, 'কোন বাহুতে?' হারি ভাই খুবই বিব্রত বোধ করলেন। তার মনে পড়ে গেলো যে যিনি ঠাকুরের চরিত্র রূপদান করছেন তার তো হাত কাটা গিয়েছে আগেই।

অ্যাকশন দৃশ্যের ঝুঁকি

সেই সময়ের সেরা অ্যাকশন ডিরেক্টর আজিম ভাই এবং মোহাম্মদ হোসেনকে রমেশ তার ছবিতে কাজ করার জন্য নিয়ে এলো। আজিম ভাইকে সবাই একনামে চিনতো তিনি বয়সেও যথেষ্ট প্রবীণ ছিলেন। তার পক্ষে একসঙ্গে পাঁচটি শুটিং ইউনিটের কাজ করাও কোনো ব্যাপার ছিলো না। অন্যদিকে হোসেন ঝুঁকিপূর্ণ ছবির নির্দেশনা দিয়েছেন। এই দু'জন শোলের জন্য একত্রে কাজ করতে লাগলেন।

প্রথম মারামারির যে দৃশ্যটি ধারণ করা হয় তা ছিল 'শিরোনাম দৃশ্য', যেখানে রামলাল এবং পুলিশ ইন্সপেক্টর ট্রেন স্টেশন থেকে নেমে ঘোড়ায় চড়ে ঠাকুরের বাড়ি আসে। যে বাড়িতে প্রসাদ শর্মা ঘোড়া সরবরাহ করেছিলেন তিনি এবং তার ছেলে ভিজু ছিলেন আজিম ভাইয়ের স্টান্টম্যান। তারা সত্যিকারের অভিনেতা অভিনেত্রীর নকলরূপে কাজ করতেন। যদিও শোলের প্রায় সব পাত্র-পাত্রীকে মুম্বাই থাকাকালীন ঘোড়া চালানোর অনুশীলন দেয়া হয়েছে, তবু তারা শুটিংয়ে নিজেরা তা করতে পারলেন না। স্টান্টম্যান ব্যবহার করতে হলো।

'অ্যাকশন বিভাগ' এটা নিশ্চিত করলো যে তাদের একাধিক রঙের ঘোড়া লাগবে। চারটা সাদা রঙের এবং পাঁচটি কালো রঙের ঘোড়া আনা হলো। শুধুমাত্র নাফরাতি নামের একটা বাদামী রঙের ঘোড়া আনা হলো। নাফরাতিতে চড়ে কালিয়া ডাকাতদের গ্রামে ঢোকার প্রথম দৃশ্যে অভিনয় করে। কালিয়ার এছাড়া কোনো উপায়ও ছিলো না, আর নাফরাতিও ছিলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে।

এই শিডিউলের শেষ 'শটটি' ছিলো একটি 'ক্রেন শট'। ক্রেনটি ছিল তিনজন ঘোড়সওয়ারের পেছন থেকে ধরা। শট চলাকালে ক্রেনটি ডাকাতের দল এবং পুরো গ্রামের ওপর ঘুরে আসে। এমন সময় নাফরাতি একটা ঝামেলা করে বসলো। সে ভিজুকে পিঠ থেকে পাথরের উপরে ফেলে দিলো। ভিজু রমেশকে বললো সে আর কখনো ঘোড়ার ওপর উঠবে না। আজিম ভাই এসে তাকে বোঝালো যে আজকে না উঠলে সে আর কোনোদিনই ঘোড়ায় ওঠার সাহস পাবে না। তিনি ভিজুকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করলেন। ভিজুর দৃশ্যটি ধারণ করা হলো।

অন্যদিকে হেমার টাঙ্গা দৃশ্যের চিত্রায়ণ

হচ্ছিল। দৃশ্যে গাড়িটা পাথরে পিছলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। রেশমা নামের একজন হেমার নকল হিসেবে কাজ করছিল। সে গাড়ি থেকে পাথরের উপর পড়ে গিয়ে ব্যথা পায় এবং বেহুঁশ হয়ে যায়। কিছুটা সেবা শুশ্রূষা করার পর তার জ্ঞান ফেরে। সে আবার শট দেয়। রমেশের ভাই অজিত যে গত কয়েক বছর ধরে লন্ডনে ছিল, মাইকেল স্যামুয়েলসনের সাথে রমেশের পরিচয় করিয়ে দিলো। সে লন্ডনে জিনিসপত্র ভাড়া দেয়ার একটা প্রতিষ্ঠান চালাতো। স্যামুয়েলসন তাকে 'স্টান্ট ডিরেক্টর' জিম অ্যালেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো। সে একবার পাকিস্তানে একটা ছবির প্রজেক্টে কাজ করেছিলো। ফলে হিন্দি ছবির স্টাইল সম্পর্কে তার কিছু ধারণা ছিলো। অ্যালেন স্টান্ট ডিরেক্টর জেরী ক্রেম্পটন, স্টান্ট সমন্বয়কারী রোমো কোমোরো, স্পেশাল ইফেক্ট নির্মাণকরী জন গান্টের সাথে একত্রিত হয়ে শোলের জন্য কাজ করতে এলো। এদের মধ্য সাবেক বিমান বাহিনীর লোক জেরীর আগেই ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। সে 'টারজান' নামে একটা চলচ্চিত্রে কাজ করেছে। রমেশের মনে হলো যেহেতু জিম এবং জেরী ভারতবর্ষে নতুন নয়, তাই তারা তার জন্য ভালো কিছু করবে। ১৯৭৪ সালের জুনে জিমের টিম ব্যাঙ্গালোর আসলো কী কী সুযোগ সুবিধা আছে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবার জন্য। সেপ্টেম্বর মাসে লন্ডনের এই দল রামানাগারাম পৌঁছল। জিম এবং জেরী বুঝতে পারলো ইংরেজি ভাষাটাই তাদের সাথে এই ইউনিটের শেষ সমস্যা নয় বরং সুযোগ সুবিধার দিক থেকেও শোলে হলিউডের তুলনায় প্রায় প্রস্তর যুগে রয়েছে। তারা ব্যাপারটা সমন্বয়ের চেষ্টা করলো। ঠাকুরকে যখন প্রশ্ন করা হলো সে কেন দেখতে সুন্দর দু'জন বদমাশ খুঁজছেন, তিনি উত্তর দিলেন, 'তারা বদমাশ হতে পারে কিন্তু সাহসী, তারা ভয়ানক, কেননা তারা লড়তে জানে, তারা খারাপ হতে পারে কিন্তু তারা মানুষ।'

ট্রেনের দৃশ্যটি তার কথাগুলোই প্রমাণ করে। এই দৃশ্যটির চিত্রায়ণ হয়েছিলো ১৯৭৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে। 'শোলে' রামানাগারামের আঞ্চলিক অর্থনীতিতে টাকার যোগান বাড়িয়ে দিলো। ট্রেনের দৃশ্যটির সময় স্থানীয় লোকজনদের কাজ করবার জন্য ভাড়া করা হতো, তাদের কেউ কেউ ছোট ছোট ব্যবসা ফেঁদে বসেছিলো। ট্রেন দৃশ্যের সবচেয়ে বিপজ্জনক অংশ ছিলো দ্রুতগতিতে এসে ট্রেনটির ধাক্কা খেয়ে বিস্ফোরিত হওয়া। এই শট নেয়ার জন্য মোট তিনটি ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছিলো। এর একটি ছিল ধাক্কা খাবার জায়গাটির পাশে যেখান থেকে সামনাসামনি ধাক্কা খাবার দৃশ্যটি ধারণ করা হবে। ট্রেনের এতো গতির ফলে যেকোনো অঘটন ঘটতে পারে। রমেশ আনোয়ারকে সাবধান করে দিল, 'এটা কিন্তু শেষ শিডিউল চলছে, অতএব সাবধানে কাজ করো।' আনোয়ার তাকে চিন্তা না করার জন্য বললো এবং নিজ দক্ষতায় কোনো অঘটন ঘটতে না দিয়ে কাজটি তুলে আনলো।

শুটিংয়ের শেষ কাজ ছিল ঠাকুর জেলের বাইরে বীরু এবং জয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং তার হয়ে কাজ করতে আহ্বান জানায় -এই দৃশ্যটি ধারণ। দৃশ্যটি ছিল ছবির শুরুর দিককার। প্রায় দু'বছরে ৪৫০ শিফট কাজ করার পর শোলের কাজ শেষ হলো।

শোলে মুক্তির আগে

আমজাদ খানের গলার স্বর ছিলো অদ্ভুত। গতানুগতিক খলনায়কদের মতো বাঁজখাই ছিল না। তার স্বর অনেকটা শোনাতো শিশুদের কফ বসে যাওয়া স্বরের মতো। তার চেহারাতেও ছিল শিশুসুলভ বৈশিষ্ট্য।

রমেশ এটা পছন্দ করতো। কেননা এটা এতোটাই অপ্রত্যাশিত যে গাব্বারের ভয় প্রদর্শনকে একটা ভিন্নমাত্রা দিতো। গলার স্বরটাও ডাকু লোকটার চরিত্রের মতো অনির্ধারিত। এই অদ্ভুত ব্যাপারটাই তাকে বেশ মানিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সেলিম-জাভেদ খুব একটা নিশ্চিত ছিলেন না। একজন শক্তিশালী খলনায়কের দুর্বল স্বর গোটা ফিল্মটাকেই ডুবিয়ে দিতে পারে। তাই তারা রমেশকে বললো আমজাদের স্বর যেন অন্য কাউকে দিয়ে ডাব করানো হয়। পরামর্শটা বাতাসে ঘুরপাক খেতে লাগলো, অনেকেই একমত হয়ে বলতে লাগলো 'খুবই নিচু আওয়াজ'। জয়া এবং জিমের মতো কেউ কেউ আবার প্রবলভাবে আমজাদের পক্ষ নিতে লাগলো। জিম রমেশকে বললো, 'এটা তোমার ছবি, তুমি যা খুশি করতে পারো। কিন্তু তুমি খুবই ভুল করবে যদি তুমি তার স্বর অন্য কাউকে দিয়ে 'ডাব' করাও।'

রমেশ দু'পক্ষের কথাই শুনলো এবং রহস্যজনকভাবে নীরবতা বজায় রাখলো।

ছবিটি ছিলো আমজাদের জন্য 'মরো অথবা করো' ব্যাপার। এতো এতো তারকার মধ্যে সে খুবই নগণ্য। এই রকম একটা বিশাল প্রকল্পে অন্য কাউকে দিয়ে তার গলা 'ডাব' করানো হলে তার কেরিয়ার শুরু হবার আগে ধ্বংস হয়ে যাবে, এই ভেবে আমজাদ খুবই মুষড়ে পড়লেন। প্রথম দিকে সেলিম এবং জাভেদ তাকে ছবিটি থেকে বাদ দিতে বলেছিলো আর এখন বলছে এই কথা! অথচ সে তার শুরুর দিকের দুর্বলতা কাটানোর জন্য অসম্ভব পরিশ্রম করেছে কিন্তু সবাই কেন তাকে সব সময় বোঝা মনে করছে? তার গলা অন্য কাউকে দিয়ে 'ডাব' করানোর পরামর্শ তার কাছে আরেকটা প্রমাণ বলে জানা হলো যে কেউ তার কেরিয়ার নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যই রমেশের। এবং তা ছিলো আমজাদ নিজেই গাব্বারের জন্য 'কণ্ঠ' দেবে। আর ঘটনা হলো ছবি মুক্তির পর এই গলার শব্দ শোনার জন্যই হাজার হাজার মানুষ 'শোলের ক্যাসেট' কিনেছিল।

অভিনেতা অভিনেত্রীদের সাথে রমেশের ছিলো খুবই আন্তরিক সম্পর্ক, সে তাদের মানসিক অবস্থা বুঝতে পারতো। তার সবচেয়ে বড় গুণ হলো ধৈর্য। সে কখনোই ভেঙে পরতো না। তার শান্ত সৌম্য ব্যবহার অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাছ থেকে সেরাটা বের করে আনতো। তার এই ব্যবহার শুধু তারকাদের জন্য ছিলো এমন নয়, ছবিতে একটি মাত্র সংলাপ আছে এমন অভিনেতাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সবচেয়ে কঠিন অংশ ছিলো 'ফাইনাল কাট'-এর জন্য সম্পাদনা করা। রমেশ তার সম্পাদক মাধব রাও সিন্ধির সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সম্পাদনার টেবিলে সময় ব্যয় করতেন।

সিন্ধির কাজটি ছিল বিশাল। সেলিম-জাভেদের চিত্রনাট্য ছিলো অসাধারণ, অনেক সম্পাদনার সূত্র চিত্রনাট্যেই দেয়া ছিল কিন্তু ছবিটি ছিলো খুব বেশি দীর্ঘ, প্রায় তিন লাখ ফিট নেগেটিভ। অথচ হওয়া উচিত ছিলো বিশ হাজার ফিটেরও কম। রমেশের সব ফিল্মের সম্পাদনা সিন্ধিই করেছে কিন্তু এবার সে ঠিক বুঝতে পারছিলো না যে রমেশ কী চাইছে।

সম্পাদনার সময় বেশ কিছু দৃশ্য পুরোপুরি বা আংশিক বাদ গেলো। হাসির দৃশ্য, সুরমা ভোপালির হোটেলে বীরু ও জয়ের খাওয়া-দাওয়া করা, 'ইয়ে দোস্তি' গানের আগে মোস্তাফ মার্চেন্টের মোটর সাইকেল চুরি করা, শচীনের মৃত্যুর দৃশ্য বাদ গেলো। গোটা ছবির চরিত্রের সাথে সম্পাদনা মিলে গেলো। দর্শক কখনোই ঠাকুরের কাটা হাত দেখেনি। দৃশ্যটা এখনও মনে হতে পারে গাব্বার বুঝি ঠাকুরের আগেই কেটে যাওয়া হাতের ওপর তলোয়ার উঁচিয়েছে, কেননা তারপরে আর না দেখিয়ে দর্শকের অনুভূতির ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কখনোই না দেখানো কিশোর আহমেদের মৃত্যুর দৃশ্যের ছিল দারুণ প্রভাব।

চূড়ান্ত সম্পাদনা করতে এক মাস সময় লেগে গেলো। সিদ্ধান্ত হলো লড়াইর দৃশ্যগুলো আরো কমিয়ে দেয়া হবে। যেই কথা সেই কাজ।

সেন্সর প্রাপ্ত চূড়ান্ত ছবির দৈর্ঘ্য হলো আঠারো হাজার ফুট, অর্থাৎ তিন ঘণ্টা বিশ মিনিট। এতো কিছুর পরেও প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনের জন্য এটা যথেষ্ট দীর্ঘই রয়ে গেলো।

এরই মধ্যে শোলের বাজেট গিয়ে দাঁড়ালো তিন কোটি রুপি। ইন্ডাস্ট্রির বোদ্ধারা একে নিছক পাগলামো বলে অভিহিত করলেন। সাড়ে বাইশ লাখ রুপি খরচ করে ছবি বানিয়ে পুঁজি ফেরত আনা কঠিন, সেখানে শোলের জন্য তো অসম্ভব ব্যাপার। অথচ তখনও সিপ্পি খরচ করছেন আর রমেশ সম্পাদনা ও শব্দ নিয়ে কাজ করে চলছেন। শুধু আবহ সঙ্গীত করার জন্য এক মাস সময় লেগেছিলো। ১৯৭০ সালে আবহ সঙ্গীত রচিত হয়েছিলো। রমেশ পঞ্চমকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। শুধু তার একটাই চাওয়া ছিল যেনো সঙ্গীতে একটা 'সিম্ফোনিক' অনুভূতি থাকে।

আবহ সঙ্গীত ছিলো পশ্চিমা সঙ্গীত দ্বারা প্রভাবিত। শিরোনাম সঙ্গীত শুরু হয় ফরাসি সুর দিয়ে। বাসন্তীর (হেমা মালিনী) টাঙ্গা গাড়ি ছোটানোর দৃশ্যে পঞ্চম শুধু তবলা ব্যবহার করেছিলো। পণ্ডিত সামতা প্রসাদা এই দৃশ্যের জন্য তবলা বাজিয়েছিলো। জয়ের (অমিতাভ) জন্য পঞ্চম নিজেই 'মাউথ অর্গান' বাজিয়েছিলো। একমাত্র আমজাদই আবহসঙ্গীত ধারণের সময় উপস্থিত ছিলেন, অন্যান্য অভিনেতারা অন্য কাজে ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন।

শুটিংয়ের শেষ দৃশ্য বীরু এবং বাসন্তীর ট্রেনে

দেখা হয়- ধারণ করা হয়েছিল আবহ সঙ্গীত তৈরির পর। তাই পঞ্চম সঙ্গীতটি সৃষ্টি করেছিলেন দৃশ্যটি না দেখে, যদিও বিষয়টি তার জন্য কঠিন ছিলো না। শুরুতেই সিপ্পি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো ৭০ মি. মি. ফরম্যাটের জন্য স্টেরিওফোনিক সাউন্ড' লাগবে। রমেশ স্টেরিওফোনিক সাউন্ড'-এর কথা মনে রেখে দৃশ্যায়নের পরিকল্পনা করেছিলো। কিন্তু স্টেরিওফোনিক কাজ করার সুবিধা ভারতে ছিল না, তার জন্য তাকে লন্ডনে যেতে হবে। জিম এ্যালেন অনুসন্ধান করে 'টুইকেনহ্যাম স্টুডিও' নামে লন্ডনে একটা স্টুডিওর খোঁজ পেলো যারা এই ধরনের কাজ করে। টুইকেনহ্যাম প্রথমে তাদের একজন শব্দ প্রকৌশলী মুম্বাই পাঠালো। সে ছবিটি দেখে নির্দেশনা দিলো কিভাবে শব্দগুলো ধারণ করতে হবে। প্রত্যেক ধরনের শব্দ আলাদা আলাদা ট্র্যাকে ধারণ করা হলো। রমেশ তার প্রয়োজনীয় সব ধরনের শব্দ মুম্বাই থেকে লন্ডন নিয়ে গেলো। শুধু গুলির শব্দ এবং 'ডিসুম-ডিসুম' বাদে। কেননা মুম্বাইর লড়াইয়ের দৃশ্যের শব্দ খুবই খারাপ। একটা ঘুসি, একটা চড় বা একটা লাথি প্রায় একই রকমের ধ্বনিসম্পন্ন। তাই লড়াইয়ের দৃশ্যের শব্দগুলো লন্ডনে তৈরি করা হলো। এজন্যে প্রায় তিন মাস রমেশ মুম্বাই এবং লন্ডন যাওয়া-আসার মধ্যে ছিলো।

জুলাইতে শেষ পর্যন্ত শোলের নির্মাণ শেষ হলো। আড়াই বছর লাগলো ছবিটি নির্মাণ করতে। কিন্তু রমেশ জানতো না যে যুদ্ধ তো মাত্র শুরু হয়েছে।

শোলেতে গাব্বার সিং মারা যায়। অন্তত সেলিম-জাভেদের লেখা রমেশের শুট করা আসল শোলেতে তো অবশ্যই। ঠাকুর তার পায়ের আঘাতে গাব্বারকে হত্যা করে। তখন তার পায়ে ছিল তার চাকর রামলালের দেয়া চোখা আংটা বসানো তলির জুতা। বাহুহীন ঠাকুর প্রথমে গাব্বারের দুই বাহু ধ্বংস করে দেয় জুতো দিয়ে পিষে পিষে। তারপর তারা একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়ায়। দু'জন বাহুহীন যোদ্ধা। সমানে-সমানে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে। তারপর ঠাকুর গাব্বারকে এমনভাবে হত্যা করলো যেন একটা বিষধর সাপকে হত্যা করা হলো। সে ততোক্ষণ পর্যন্ত গাব্বারকে আঘাত করা থামালো না যতোক্ষণ না গাব্বার মারা গেলো। তারপর ঠাকুর ভেঙে পড়লো, কাঁদতে লাগলো, চিৎকার করে দীর্ঘক্ষণ কাঁদলো, তার অভিযান সম্পন্ন হলো। কিন্তু তারপরও তার মধ্যে এক বিশাল শূন্যতা। বহু আত্মাহুতির পর এই বিজয়, প্রতিশোধের আগুনে সবই জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে গেলো।

এই সমাপ্তিটা 'সেন্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সেন্সরস্'-এর পছন্দ হলো না। পর্দায় কী দেখানো যাবে সে ব্যাপারে সেন্সর বোর্ডের সিদ্ধান্তই ছিলো চূড়ান্ত, তারা কিছু নিয়ম-নীতি পালন করতো। তারা ব্যক্তির হাতে আইন তুলে নেয়াটা মানতে পারলো না। তারা ছবিটির মারামারির দৃশ্য নিয়েও আপত্তি তুললো। যদিও দৃশ্যগুলো দৃশ্যমান ছিল না, কিন্তু শুধু ইঙ্গিতগুলোর প্রভাবই ছিলো অনেক সুদূরপ্রসারী। কেউ গাব্বারকে

¯c ci‡l i cv_bvq evmšx Pwi‡Î †ngv gwjbx

ঠাকুরের হাত কাটাতে দেখেনি, দেখেছে তার তলোয়ার উঁচু করতে শুধু। তারপর ঠাকুরের জামার হাতা বাতাসে পত্পত করে উড়ছে। যা দর্শক কখনোই ভুলতে পারবে না। রমেশ লড়াইগুলোকে করেছে আকর্ষণীয় এবং শৈল্পিক। তো, রমেশকে আরো অনেক দৃশ্য বাদ দিতে হলেও প্রথম তাকে ছবির শেষ পরিণতিকে পরিবর্তন করতেই হবে।

রমেশ খুবই রেগে গেলো। এটা তার প্রতিভার প্রতি এক ধরনের অপমানও বটে। ছবির প্রতিটি মুহূর্ত খুবই যত্নের সাথে তৈরি করা হয়েছিলো। কোনো দৃশ্যেই বাহুল্য ছিলো না। অথচ বোর্ড শুধু দৃশ্যাংশ বাদ দিতেই বলছিলো না বরং পুরো উপসংহারটাই পরিবর্তন করতে বলছিলো। শেষ মুহূর্তে পুলিশ আসবে এবং ঠাকুরকে বিরত করবে গাব্বারকে হত্যা করার হাত থেকে। এটা এক ধরনের উপহাস। যে রকমটা শত শত ছবিতে হয়েছে। এটা ছিল মূল ছবিটার জন্য সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। এই নতুন উপসংহার নিয়ে কখানোই এটা রমেশের ছবি হয়ে দাঁড়ালো না বরং আর দশটা ছবির মতোই হলো। রমেশের শিল্পীসত্তার স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত হলো। কম্প্রোমাইজ করা না করার কিছুই ছিলো না, কারণ তাকে তা করতে বাধ্য করা হলো। কিন্তু যে ছবির জন্য রমেশ আড়াই বছর সময় ব্যয় করেছে সে আর এখন দুম করে উপসংহার পরিবর্তন করতে রাজি হলো না।

বোর্ডের নানা স্তরের সাথে মিটিং বসানো হলো। তাদের পুরো ব্যাপারটা বোঝানো হলো। কিন্তু কে শোনে কার কথা। সিপ্পি ক্ষমতাধর এমন কাউকে ফোন করতে বাকি রাখলো না যাদের প্রভাব বোর্ডের ওপর খাটতে পারে। বাবা ছেলে সিপ্পি ও রমেশ সব কিছু করার চেষ্টা করলেন কিন্তু সাফল্য এলো না। এক সময় রমেশ তার নাম প্রত্যাহার করতে চাইলো ছবি থেকে। কিন্তু প্রযোজক ও পিতা সিপ্পি, নির্দেশক ও পুত্র রমেশকে বোঝানোর চেষ্টা করলো, আমাদের এতো খরচ হয়ে গেছে যে বড় যুদ্ধ করা, আদালতে যাওয়ার মতো যথেষ্ট অর্থ হাতে নেই।

ছবি মুক্তির তারিখ ঠিক করা হলো ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট। এর দুই মাস আগে পলিডোর ছবিটির সঙ্গীতের ক্যাসেট বাজারে মুক্তি দিয়ে দিয়েছে। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে প্রায় ত্রিশ হাজার কপি বাজারজাত হলো। তারা বিক্রেতাদের জন্য বিশেষ কিছু স্কিমও দিয়েছিলো কিন্তু বছরের শেষ দিকে সাড়ে সাত শতাংশ অবিক্রিত ক্যাসেট ফেরত এলো। পলিডোর বিক্রেতাদের বললো তোমরা তোমাদের ইচ্ছে মতো ক্যাসেট নিতে পারো, কিন্তু অবশ্যই অবিক্রিতগুলো শোলে মুক্তি পাবার আগে ফেরত দিতে হবে। কিন্তু মুক্তি পাবার পর যদি শোলে হিট করে তবে ক্যাসেট নিতে হলে বেশি মূল্য দিতে হবে। কিন্তু ছবি মুক্তিতে যেকোনো প্রকার দেরি পলিডোরের ব্যবসার জন্য ক্ষতিকর হবে। রমেশের আর কিছুই করার ছিলো না। তাকে নতুন করে শুট করতেই হবে।

এটা ছিল ভীষণ কঠিন, ইতিমধ্যেই ২০ জুলাই চলে এসেছে অথচ এই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাকে রি-শুট করতে হবে, ডাবিং করতে হবে, সাউন্ডট্র্যাক নিতে হবে, সেগুলো লন্ডন থেকে প্রক্রিয়াজাত করে আনতে হবে।

ছবির রিলিজ প্রিন্ট তৈরি করতে হবে। সঞ্জীব কুমার ছিলেন সোভিয়েট ইউনিয়নের এক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। তাকে ব্যাঙ্গালোরের শুটিং স্পটে উড়িয়ে নিয়ে আসা হলো। অনেক দিন পর সবাই আবার একসঙ্গে শুটিং করছে। সবাই সে রকমই আগ্রহ দেখালো যেমনটা তাদের পূর্বে ছিলো। সেন্সরের পরও কিছু দৃশ্য কর্তন করলো, তারপর এক সময় ফিল্ম সেন্সর বোর্ড সন্তুষ্ট হলো। লন্ডন থেকে মূল ৭০ মি. মি. প্রিন্ট করিয়ে আনা হলো। মুম্বাই ফিল্ম সেন্টারে ৩৫ মি. মি. প্রিন্টগুলো তৈরি করা হলো। শোলের দুর্বল সংস্করণটি অবশেষে মুক্তি পেলো। কিন্তু গুজব রয়েছে যে পৃথিবীর কোথাও কোথাও শোলের আসল দৃশ্যগুলো ক্যাসেট ও ডিভিডিতে পাওয়া যায়।

শোলে আসছে এমন প্রচারণা শুরু হলো।

পোস্টার লেখা হলো- 'দ্য গ্রেটেস্ট স্টোরি এভার টোল্ড' ('এতো দিন পর্যন্ত করা সবচেয়ে মহান গল্প) আরো লেখা হলো- 'দ্য গ্রেটেস্ট ফিল্ম এভার মেইড (এতো দিন পর্যন্ত তৈরি হওয়া সবচেয়ে মহান চলচ্চিত্র)।' ছবি মুক্তির দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগলো রমেশ ততোই হতবুদ্ধি হয়ে যেতে লাগলো। জিপি সিপ্পি লন্ডনে পুরো ছবিটি দেখলো। তার পুত্র তাকে চমৎকৃত করেছে। সিপ্পি বললেন, আগামী দশ বছর এই ছবি হলগুলোতে চলবে।'

বিয়োগ বিধূর, নাটকীয়, এবং ভাবাবেগে ভরপুর...

শুরু হলো 'শোলে' নিয়ে নানা গুজব ও আলোচনা। প্রিন্ট আর নেগেটিভ বোম্বে-লন্ডন যাতায়াত করতে লাগলো। কত রকমের কথাই না ইন্ডাস্ট্রিতে ছড়াতে থাকলো। 'শোলে'কে 'শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' লেবেল দিয়ে ছাড়পত্র দেয়া হবে। সেন্সর বোর্ড নতুন করে কিছু দৃশ্য ধারণ করতে বলেছে। এমনও শোনা গেলে যে ৭০ মিমি. প্রিন্ট রেডি হয়নি বলে ছবি মুক্তির তারিখ বাতিল করতে হচ্ছে।

একটি ম্যাগাজিনে লেখা হলো 'যেখানেই যাই সেখানেই শুধু শোলে নিয়ে আলোচনা। এটা মাঝে মধ্যে আমাদের কাছে এলার্জির মতো মনে হয়েছে'।

শোলে মুক্তির জন্যে প্রধান ভেন্যু করা হলো বোম্বের মিনার্ভা প্রেক্ষাগৃহকে। মিনার্ভাকে বলা হতো 'মহরাষ্ট্রের গৌরব'। দেশের সবচেয়ে বড় এই সিনেমা হলটির ধারণক্ষমতা ছিল ১৫০০, ৬ ট্র্যাকের সাউন্ড বিশিষ্ট হলটির পর্দাও ছিল ৭০ মিমি. ছবি প্রদর্শনের উপযুক্ত। বিয়েবাড়ির সাজে সাজানো হলো হলটিকে ছবি মুক্তি উপলক্ষে। ৩০ ফুট লম্বা ব্যানারে শোভা পেতে থাকলো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাম। তাদের বিরাট বিরাট ছবিতে ছেয়ে গেল ভেতরের চত্বর। ১৫ আগস্ট ছবি মুক্তি দেয়া হবে, তার আগের দিন প্রিমিয়ার। মিনার্ভা হল ছাড়াও আরো একটি মিলনায়তনে ছবি প্রদর্শনের আয়োজন সম্পন্ন হলো। কিন্তু সমস্যা হলো ৭০ মিমি প্রিন্ট তখনও এসে পৌঁছায়নি, সেটা আটকে আছে কাস্টমসে।

ছবির শুটিং সম্পন্নের পর প্রোডাকশনের অনেক কাজ করতে হয়েছে লন্ডনে। সে জন্যে অনেক ধরনের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন পড়েছে। একজন সিনিয়র আমলা হঠাৎ বিগড়ে গেলেন। তার মনে হলো যে তাকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দেয়া হয়নি। ফলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সেই আমলা সিপ্পিদের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে পড়লেন। ইউনিট প্রিন্ট আনার জন্যে লন্ডনে গেলে আমলাটি ভারতীয় দূতাবাসকে জানিয়ে দিল তাদের ওপর কড়া নজরদারি করতে।

সিপ্পিরা ভালোই বৈরিতার সম্মুখীন হলো। রমেশ বোম্বে পৌঁছলে তাকে ব্যাপক তল্লাসি করা হলো। আটকানো যায় এমন কিছু না পেয়ে ওই আমলার নির্দেশে ছবির প্রিন্ট খালাস করা হলো না। ১৪ আগস্ট সকালেও কাস্টমস অফিসে পড়ে থাকলো শোলে ছবির প্রিন্ট।

ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয় জি পি সিপ্পি। সেও

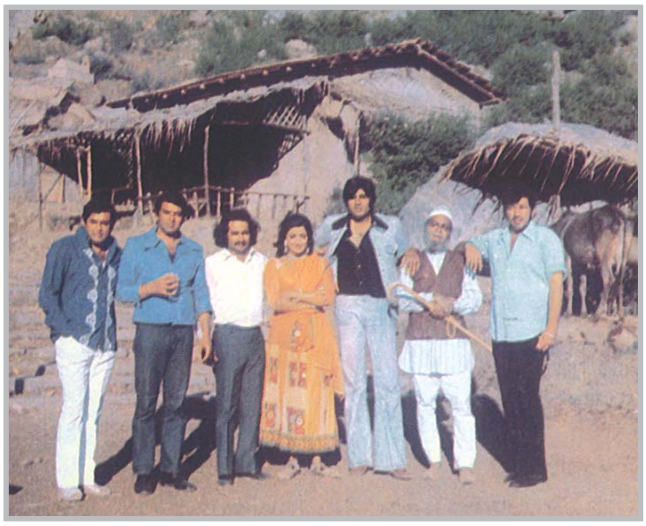

†kv‡ji gj KjvKkjxiv (Qwe‡Z Rqv fv`o× †bB)

একশনে গেল। উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক বসার ব্যবস্থা করে ফেললো। তার পক্ষে একজন জাঁদরেল আইনজীবী প্রতিনিধিত্ব করলেন বৈঠকে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একজন মুখপাত্র এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ভি সি শুক্লার মধ্যে বৈঠক হলো। শোলের প্রিমিয়ার শোর প্রধান অতিথিও ছিলেন এই মন্ত্রী। তিনি সরাসরি এই আমলাকে ডাকলেন এবং দ্রুত শোলের প্রিন্ট ছাড় করানোর নির্দেশ দিলেন। 'ইয়েস স্যার' বললেও আমলাটি বেশ কয়েক ঘন্টা পিছিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলো শোলে প্রিন্টের ছাড়। ফলে প্রিমিয়ার শোতে আর ৭০ মি.মি প্রিন্ট প্রদর্শন সম্ভব হলো না। দেখানো হলো ৩৫ মি.মি. প্রিন্ট।

যা ভাবা গিয়েছিল তা হলো না। দর্শকরা তেমন প্রতিক্রিয়া দেখালো না। কেউ তেমন হাসলো না, কাঁদলোও না।

কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। দিলীপ কুমার পছন্দ করলেন ছবিটা। রাজকাপুর 'নাইস' বলে মন্তব্য করলেও আরেকটু বেশি রোমান্স থাকতে পারতো বলে মতপ্রকাশ করলেন। রাজেন্দ্র কুমার হিসেব কথা বললেন- মায়ের চরিত্র নেই ছবিতে। তাছাড়া দুই বন্ধুর বন্ধুত্ব বা কী রকম যে এক বন্ধুর বিয়ের তোড়জোড়ে অন্যজন অংশগ্রহণ করে না! একজন বিখ্যাত ব্যক্তি তো বলেই ফেললেন, ভারতীয়রা এমন ছবি গ্রহণ করে না। কারণ বন্ধুত্বের ভেতরে বাজে রুচির প্রকাশ ঘটেছে। ভিলেন আমজাদের গলাও চড়া নয়।

সমালোচকরাও একমত হলেন। ইন্ডিয়া টুডেতে কে. এল. আমলাড়ি 'মৃত অঙ্গার' শিরোনামে লিখলেন, থিম-বিচারে ছবিটি গুরুতর ত্রুটিপূর্ণ। ফিল্মফেয়ার পত্রিকায় বিক্রম সিং বললেন, ছবির প্রধান সমস্যা হলো ওয়েস্টার্ন উপাদানকে ভারতীয় পটভূমিতে প্রতিস্থাপনে অসফল হওয়া। 'ফিল্ম ইনফরমেশনে' লেখা হলো- কোনো শ্রেণী বা পরিবার এই ছবি দ্বিতীয়বার দেখতে সিনেমা হলে আসবে না। 'ট্রেড গাইড' ছবিটিকে মাইল ফলক বললেও 'দিওয়ার' ছবির সঙ্গে নেতিবাচক তুলনা টেনে প্রশংসা করা হলো।

এখন পুরো বিষয়টি আমজনতার হাতে, দর্শক শ্রেণীর হাতে। ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫, বোম্বে অঞ্চলে শোলের চল্লিশটি প্রিন্ট একযোগে প্রদর্শনের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হলো।

মুম্বাইয়ের সেই কুখ্যাত বৃষ্টি নেমে আসলো মুষলধারে, ভিড় ঘুরে গেল। সত্যি বলতে কি অগ্রিম টিকিট ছাড়ার অনেক আগেই জনতা লাইনে দাঁড়িয়ে গেল। পুলিশকেও সতর্ক করা হলো কালোবাজারিদের ব্যাপারে। একটা হল পাওয়া গেল যেখানে কর্তৃপক্ষ আগেভাগেই এক হাজার টিকিট সরিয়ে রেখেছে নিজেদের প্রয়োজনেই। ভিড়ের ধরন দেখে সিনেমা পন্ডিতরা ধারণা করলেন প্রথম সপ্তাহেই ব্যবসা এগার লাখ রুপি ছাড়িয়ে যাবে।

বোদ্ধা সমালোচকরা তাদের কঠোর মত প্রকাশ করে ফেলেছেন ইতিমধ্যেই। ছবির কালোবাজারিরাও শোলেকে 'মেরা গাঁও মেরা দেশ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ বলে চিহ্নিত করে ফেলেছে। কিন্তু একমাত্র জিপি সিপ্পিরই আশা ছিল যে এই সবকিছু ভুল প্রমাণ করে দেবে দর্শক, যাদের জন্যে এই ছবি তৈরি করা হয়েছে।

১৫ আগস্ট, শুক্রবার। মুক্তি পেলো শোলে। কিন্তু প্রতিক্রিয়ার তরঙ্গ উঠলো না। রমেশ এক হল থেকে অন্য হলে ছুটে যাচ্ছেন দর্শকদের প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্যে। সপ্তাহান্তে উত্তেজনা চূড়ান্ত পর্যায়ে। মিলনায়তন দর্শকপূর্ণ হচ্ছে কিন্তু প্রতিক্রিয়া মিলছে মিশ্র।

সিনেমাবোদ্ধারা এবার বিপর্যয়ের আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। রমেশকে কেউ সেটা না বললেও সবার চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা। সবাই তার সঙ্গে দেখা করছে এমনভাবে যেন সে মূর্তিমান এক শোক।

জিপি সিপ্পি তৎপর হলেন। অমিতাভের বাসায় আলোচনায় বসলেন। তখন অবশ্য ছবি পাইরেসির কোনো আশঙ্কা ছিল না। ছবি হিট হবে ভেবে অন্য রাজ্যগুলোয় একাধারে মুক্তি দেয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন ছিল। জানজির এবং দিওয়ার-এর পর বিশাল তারকায় পরিণত হওয়া অমিতাভের জন্যে শোলের ফ্লপ হওয়া মানে ওই বড় তারকার অনিবার্য মৃত্যু। ভরাডুবি থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হচ্ছে শোলের শেষটা বদলে দেয়া। তার মানে হলো এই যে দুটি যুগল সূর্যাস্তের সময়ে সুখী ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে। অর্থাৎ ডাকুর গুলি খেয়ে বচ্চনের বেঁচে ওঠা। মরা চলবে না। সেলিম-জাভেদ প্রবল মত ব্যক্ত করলো যে ছবিতে কোনোভাবেই হাত দেয়া যাবে না। রমেশ

প্রথমে ছবির দৃশ্য পরিবর্তনের ব্যাপারে মত দিয়েছিল। তার মস্তিষ্ক পরিবর্তনের পথে থাকলেও হৃদয় তাতে সাড়া দিচ্ছিলো না। শেষ পর্যন্ত হৃদয়ের জয় হলো। সিনেমার সুখী পরিসমাপ্তি দর্শকদের তাৎক্ষণিকভাবে স্বস্তি দিলেও একটা অমীমাংসিত অসমাপ্ত অনুভূতি নিয়ে সিনেমা হল ত্যাগ করলে ছবিটির আবেদন বাড়ে। তাই শোলের একটি ফ্রেমেরও বদল ঘটানো ঠিক হবে না।

পরের সপ্তাহে শোলে টিমের উৎকণ্ঠা পরিণত হলো হতাশায়। সোমবার যখন পুনরায় অগ্রিম টিকেটের জন্য কাউন্টার খুলে দেয়া হলো তখন মিনার্ভাসহ দুটি হলের সামনে- ভদ্রোচিত ভিড় দেখা গেল। ওই হল দুটোতে শোলের ৭০ মিমি প্রিন্ট প্রদর্শিত হচ্ছে। অন্য হলগুলোর অগ্রিম টিকেট সংগ্রহকারীদের সংখ্যা সাকুল্যে তিনজন হবে। ম্যাটিনি শোগুলো তখনও অর্ধেক খালি থাকছে। রমেশের মনে হতাশা।

প্রথমবারের মতো সে ফ্লপ হতে যাচ্ছে এমন ভাবনা মন দখল করে থাকলো। ফিল্ম সেন্টারে গিয়ে সে শোলের প্রিন্ট নির্মাণ বন্ধ করে দিল। ওদিকে জিপি সিপ্পি একমাত্র ব্যক্তি যিনি আশা জ্বালিয়ে বসে আছেন। যদিও তার হৃদয়ের অপর পৃষ্ঠা ভরে আছে আশঙ্কা আর দুশ্চিন্তায়। বিগ বাজেটের এই ছবি ফ্লপ হওয়া মানে তিনি আর ভবিষ্যতে কোনো ছবি নির্মাণ করতে পারবেন না প্রয়োজনীয় টাকার অভাবে। এটা তো তার কাছে জুয়া খেলার মতোই। বাজিতে সব টাকা ধরে আছেন হারলে ফতুর হতে হবে। এমন গুজবও ডালাপালা মেললো যে সিপ্পি পরিবার দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।

২২ আগস্ট ব্যাঙ্গালোরের ৬টি হলে মুক্তি দেয়া হলো শোলে। সুরেশ মালহোত্রা এ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য পার্টির আয়োজন করলেন। পুরো টিম এলো ব্যাঙ্গালোর। গত মাসেই তিনি পত্রিকাকে বলেছিলেন যে শোলে কোটি টাকার ব্যবসা করবে। কিন্তু তার সেই দাবির প্রতিফলন বাস্তবে দেখা যাচ্ছে না। সুরেশ পছন্দ করেছিলেন ছবিটা। তাই রমেশ যখন ব্যবসার স্বার্থে কিছু কিছু দৃশ্য বাতিলের কথা তুললেন সুরেশ রাজি হলেন না ছবি থেকে এক ইঞ্চি বাদ দিতেও।

অমিতাভ-জয়া দু'জনেই এই ছবির সঙ্গে যুক্ত ছিল ব্যক্তিগতভাবে তাদের আবেগ নিয়ে। তাই ছবিটির সম্ভাব্য ব্যর্থতা তাদেরকে বিচলিত করে তুলেছিল।

আমজাদ চুপচাপ হয়ে গেল। আমজাদ দুঃখভরে বলেছিল, ছবি তো ফ্লপ করছে। সেলিম-জাভেদ রমেশকে বলেছে এজন্যে আমার কণ্ঠস্বরই নাকি দায়ী।

কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিতে শুরু করলো পত্রপত্রিকাগুলো। 'ট্রেডগাইড' শোলের অর্থনৈতিক পর্যালোচনা তুলে ধরে দেখালো যে এটা পরিবেশকদের দারুণ ক্ষতির সম্মুখীন করছে। অমিতাভের মৃত্যু এবং জয়া ও হেমা মালিনীর সংক্ষিপ্ত চরিত্র দর্শকরা গ্রহণ করেনি।

সেলিম-জাভেদ তখনও আস্থাশীল যে তাদের ছবি ব্যবসা সফল হবে। পত্রিকায় এই মর্মে তারা বিজ্ঞাপনও দিল যে তারা ধারণা করছে ভারতের প্রতিটি প্রধান রাজ্যে এই ছবি কোটি টাকার ওপরে ব্যবসা করবে। পত্রিকাওয়ালারা বিদ্রূপ করতে ছাড়লো না, তারা ফোড়ন কাটলো- যদি প্রতিটি রাজ্যে ৪০ লাখ টাকাও উঠে আসে তাহলে সিপ্পিকে ভাগ্যবান বলতে হবে।

আসলে সেলিম-জাভেদ কম করেই বলেছিল। পরবর্তী সপ্তাহে অবস্থা পাল্টে গেল। গীতা সিনেমার মালিক রমেশকে বললো যে, ভেবো না, তোমার ছবি সুপারহিট হবে। এই প্রথম রমেশ তার ছবি সম্পর্কে ভালো কিছু শুনলো। সে সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে জানতে চাইল, কী ভাবে তুমি এতটা নিশ্চিত যে শোলে হিট হবে? লোকটি বললো, কারণ আমার হলে আইসক্রিম আর কোমল পানীয় বিক্রি দারুণভাবে কমে গেছে। তার মানে হলো দর্শকরা বিরতির সময়ে হল থেকে বেরিয়ে আসছে না। অপেক্ষা করছে ছবি শুরুর জন্য এবং ছবিটা তাদের ভাবাচ্ছে। ছবিটি তাদের ভাবাচ্ছে বলেই চটজলদি কোনো সাড়া বা প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তাদের কিছুটা সময়ের প্রয়োজন ছিল। এখন সুস্পষ্টভাবেই শোলে তার দর্শকদের খুঁজে পেয়েছে।

মুখে মুখে সরস গুজব ছড়িয়ে পড়লো। দৃশ্যটি মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা পেলো, আর শব্দ হয়ে উঠলো চমক- যখন বীরু ক্লাইমেক্সের সময় শূন্যে কয়েন ছুঁড়ে মারলো আর ৭০ মি.মি. প্রিন্টের দর্শকেরা তাদের আসনের নিচে কয়েনটা খুঁজতে লাগলো। তৃতীয় সপ্তাহে লোকের মুখেমুখে ফিরতে লাগলো ছবির সংলাপ। তার সরল অর্থ হলো দর্শকদের একাংশ একাধিকবার ছবিটা দেখছে।

কিন্তু ছবির গানের রেকর্ড দর্শকদের কাছে গছানো যাচ্ছিল না। পলিডোর কোম্পানি ডিসকাউন্টের ঘোষণা দিয়ে হলে হলে স্টল বসালেও দর্শকরা ক্যাসেট কিনছিল না।

ছবির গান এত ভালো অথচ তা বিক্রি হচ্ছে না কেন? ভাবনায় পড়ে গেল পলিডোর কোং। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা দর্শকদের সঙ্গে হলে বসে ছবিটা দেখতে নিয়ে বুঝলো যে ছবির সংলাপ অসাধারণ। দর্শকরা এই সংলাপ উপভোগ করছে। তখন পলিডোর ৫৮ মিনিটের রেকর্ড বের করলো নির্বাচিত সংলাপের। বলাই বাহুল্য তার প্রধান আকর্ষণে পরিণত হলেন গাব্বার সিং, ওরফে আমজাদ গান।

ছবি হিট হতে শুরু করলো, স্রোত উল্টে গেল। ৬ সেপ্টেম্বর 'ট্রেড গাইড' আবার লিখলো, শোলে এখন নিরাপদ, কিন্তু এটাই সব? সম্পাদকীয়তে বলা হলো যে শোলে আরেকটি 'রকি' অথবা 'রোটি কাপড়া আওর মাকান, কিংবা 'দিওয়ার' হতে পারতো। দুর্ভাগ্যক্রমে তা হয়নি।'

মিনার্ভা হলের সামনের লাইনের দৈর্ঘ্য কিলোমিটার ছাড়িয়ে গেল। বাসস্টপেজের নতুন নামকরণ হলো 'শোলে স্টপেজ'। ব্যাঙ্গালোর থেকে রামনাগারামে চালু হলো বিশেষ বাস সার্ভিস। রামনাগারমের প্রতিটি মানুষ শোলে দেখার জন্য উন্মুখ- যেন এটা তাদেরই ছবি। শোলের টিকেট আর বাসের টিকেট এক সঙ্গে প্যাকেজ হিসেবে বিক্রি হতে শুরু করলো। ফলে টিকেট প্রাপ্তির বিড়ম্বনা দূর হলো রামানাগারামের অধিবাসীদের।

টিকেটের কালোবাজারিদের তো তখন পোয়াবারো। প্রথমবারের মতো ভারতের কোনো ছবির জন্য কালোবাজারিতে টিকেটের দাম ১০০ রুপির উপরে উঠলো। ১৫ রুপির ব্যালকনির টিকেট কালোবাজারে ২০০ রুপিতে বিক্রি হতে থাকলো। এমনকি মুষলধারে বৃষ্টির দিনেও এর ব্যতিক্রম ঘটলো না। একবার মিনার্ভা হল জলবন্দী হয়ে পড়লো, লবিতে ৪ ফুট পানি জমে গেল, তবু শোলে দেখায় এতটুকু ক্ষান্তি নেই।

দশম সপ্তাহের পরে শোলেকে সুপারহিট ছবি হিসেবে ঘোষণা দেয়া হলো। অক্টোবরে ছবিটি রীতিমতো ব্লকবাস্টারে পরিণত হলো। দিল্লি, বেঙ্গল, কেন্দ্রীয় রাজ্য এবং হায়দাবাদে ছবিটি বক্স অফিসের পূর্বকার রেকর্ড ভঙ্গ করলো।

ছবির সকল পাত্রপাত্রীই সুপারস্টারে পরিণত। সবাইকে ছাড়িয়ে গেল আমজাদ খান। তাকে দর্শকরা ভালোবাসতো, আবার ঘৃণাও করতো, অদ্ভুত এক সম্পর্ক। পলিডোর আবার বাজারে ছাড়লো ১৫টি সংলাপের রেকর্ড। তার মধ্যে গাব্বার সিংয়ের সংলাপটাই বড়ো। শিশুরাও পছন্দ করলো সুর করে করে গাব্বার সিংয়ের সংলাপ উচ্চারণ। ব্যাপারটা লুফে নিল বিজ্ঞাপন নির্মাতারা। বিস্কুটের বিজ্ঞাপনে চলে এলো গাব্বার সিং ওরফে আমজাদ খান।

এর আগে বিজ্ঞাপনে চিত্রতারকারা ব্যবহৃত হতেন, তবে সরাসরি ছবির চরিত্র হিসেবে নয়। এবারই প্রথম ছবির চরিত্র চলে এলো বিজ্ঞাপনে, তাও একটি নেতিবাচক চরিত্র। আর পণ্যটি, অর্থাৎ ব্রিটানিকা কোম্পানির বিস্কুটের ভোক্তা হলো শিশুরা। 'গাব্বার কা আসলি পাসান্দ' শীর্ষক ওই বিজ্ঞাপনটিও হিট হলো, শোলে প্রদর্শনের আগে এই বিজ্ঞাপন চালাতে শুরু করলো হলওয়ালারা। বিস্কুটের বিক্রিও রাতারাতি দ্বিগুণ হয়ে গেল।

আমজাদ এবং আসরানি একবার গুজরাটে আমন্ত্রিত হলেন একটি স্টুডিও উদ্বোধন অনুষ্ঠানে। বিমান বন্দর থেকে জায়গাটা ৪০ কি.মি দূরে। গাড়ি করে যাওয়ার পথে আমজাদের ছেলে পানি খেতে চাইলে ছোট্ট একটা দোকানে তারা থামলো। আশপাশে দু-চার মাইলের ভেতর কোনো দোকান বা হোটেল নেই। তারা শুনতে পেলো যে গাব্বার সিংয়ের সংলাপ বাজছে ক্যাসেটে। দোকানের মালিক তাদেরকে খাবার ও পানীয় পরিবেশন করলেও বুঝলো না যে স্বয়ং গাব্বার সিং তার সামনে উপস্থিত। একবার শহরের এক বস্তির পাশ দিয়ে গাড়ি করে যাওয়ার সময় আমজাদ শুনতে পেলো যে নোংরা কুটিরের ভেতর থেকে তারই আওয়াজ ভেসে আসছে। আমজাদ আবেগাপ্লুত হলো এবং গাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় বসে কাঁদতে থাকলো।

উপসংহার

পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে শোলে প্রদর্শিত হয়েছিল। মিনার্ভায় পুরো তিন বছর চলার পর দুই বছর শুধু ম্যাটিনি শোতে শোলে দেখানো হতো। এমনকি ২৪তম সপ্তাহটিতেও হাউসফুল

হতো। জিপি সিপ্পি হাউসফুল হওয়া ছবির প্রদর্শন স্থগিত করেছিলেন কারণ রমেশের পরবর্তী ছবি 'শান' মুক্তির অপেক্ষায় ছিল। জনশ্রুতি আছে যে শোলের টিকেটের কালোবাজারিরা এপার্টমেন্ট কিনতে পেরেছিল উপার্জনের টাকায়। ধর্মেন্দ্র একটা কৌতুক বলতো সব সময়। এক ভদ্রলোক কয়েক বছর বিদেশে কাটিয়ে দেশে ফিরে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলো, দোস্ত আমার অনুপস্থিতিতে কী কী ঘটেছে? বন্ধুটি উত্তরে বলেছিল, কিছুই না, সেই শোলে ছবিই চলছে সিনেমা হলগুলোতে আর স্টুডিওতে এখনও রাজিয়া সুলতানার শুটিং চলছে।

সারা দেশে আলোড়ন তোলা ছবি শোলে 'ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড ১৯৭৫'-এ মাত্র একটি শাখায় পুরস্কার পেলো। বেশি পুরস্কার পেলো 'দিওয়ার'। এই দিওয়ার-এর জন্যই সেলিম-জাভেদ জুটি শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার, শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা এবং শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যের পুরস্কার পেল। কিন্তু শোলের জন্যে একটিও নয়। জাভেদ এখনও পরিহাস করে বলে এক বছরে কোনো লেখকের একাধিক উত্তম কাজ করা ঠিক নয়। দিওয়ারের জন্যই ইয়াশ চোপরা পেলেন শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার। শশীকাপুর পেল শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতার সম্মান। শোলে পেলো কেবল শ্রেষ্ঠ চিত্রসম্পাদনার জন্য পুরস্কার। যদিও বক্স অফিসে শোলের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। প্রথম রানেই শোলে অর্জন করেছিল ৩৫ কোটি রুপি। এর পরের অবস্থানেই ছিল 'জয় সন্তোষি মা' যেটি ব্যবসা করেছিল ৬ কোটি রুপির। প্রথম বছরেই শোলের ১৯০টি প্রিন্ট তৈরি করা হয়েছিল। পালিডোর কোম্পানি ৫ লাখ রেকর্ড এবং ক্যাসেট বিক্রি করে ১০ কোটি রুপির মিউজিক মার্কেটের অর্ধেকটাই বাজিমাত করেছিল। তবে গান নয়, সংলাপের রেকর্ড দিয়ে। ১৯৯৪ সালে হাম আপকে হ্যায় কৌন মুক্তির আগে পর্যন্ত শোলেই ছিল বক্স অফিসে রেকর্ড। জিপি সিপ্পি মনে করেন সারা পৃথিবী মিলিয়ে শোলের দর্শক সংখ্যা নিশ্চয়ই ভারতের মোট জনসংখ্যার কম নয়। ১৯৮২ সালে পুনরায় যখন শোলের স্বত্ব বিক্রির সময় আসলো তখন ৫০ লাখ টাকা মূল্য উঠলো। এর ৫ বছর পরপর দুবার স্বত্ব বিক্রির সময়েও মুনাফার নতুন রেকর্ড তৈরি হলো। ৯০০ প্রিন্ট তৈরি হলো শোলের।

২৬ জানুয়ারি ১৯৯৬, দূরদর্শনে দেখানো হলো শোলে। কেবল অপারেটরদের জন্যে সুবর্ণ সুযোগ এসে গেল বারবার তা প্রদর্শনের। পরিবেশক সুরেশ মালহোত্রার ভাষ্য : 'কয়েক বছর পরপরই নতুন নতুন দর্শক শোলে দেখতে আসে, যেমন দেখতে আসে তাজমহল।' পরিবেশক শ্যামশ্রফ বলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মতনই শোলের সূর্য কখনোই অস্ত যায় না।

অনেক সময় কীর্তিমানকে ছাড়িয়ে যায় তার কোনো কোনো কীর্তি। সেখান থেকে তিনি আর বেরিয়ে আসতে পারেন না। অরসন ওয়েলস বেরুতে পারেননি তার 'সিটিজেন কেন' থেকে। রমেশও বেরুতে পারেননি 'শোলে' থেকে। যদিও রমেশ 'শোলে'কে পুঁজি করে কখনোই কিছু করেননি, তিনি বানিয়েছেন নতুন নতুন ছবি, নতুন নিরীক্ষা করেছেন। ব্যতিক্রম কিছু করতে চেয়েছেন। শহুরে জেমস বন্ডের আঙ্গিকে 'শান' বানিয়েছেন রমেশ শোলের পাত্র-পাত্রী নিয়ে। শান ব্যবসাও করেছে কিন্তু কল্পনার ধারেকাছেও পৌঁছুতে পারেনি। তার 'শক্তি' ছবিটিও আলোচিত হয়েছে, পুরস্কার পেয়েছে। সাগরের ব্যাপারেও একই কথা বলা চলে। পরবর্তীকালে রমেশ মেগাসিরিয়াল 'বুনিয়াদ' বানিয়েছেন। যা দেখার জন্য লাহোর থেকে মুম্বাই পর্যন্ত রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যেতো।

সেলিম-জাভেদ জুটি সত্তর দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত হিন্দি ছবির ধারা তৈরি করেছে। চাচা-ভাতিজা, ডন, ত্রিশূল, দস্তানা হিট হয়েছে। কিন্তু তাদের প্রথম যৌবনের ছবি 'জানজির', 'দিওয়ার' কিংবা 'শোলে'র মতো ম্যাজিক দেখাতে পারেনি কোনো ছবিই। ছবির বাজারে তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন- ২১ লাখ রুপি পর্যন্ত উঠেছে তাদের সম্মানীর অঙ্ক। কখনো কখনো তারা শতকরা পঁচিশ ভাগ লভ্যাংশও অর্জন করেছেন। কোনো লেখকই তাদের মতো ব্যবসা সফল হতে পারেনি।

একসময় ইগো সমস্যা হয়েছে। তখন দু'জন পৃথক হয়ে দু'দিকে চলে গেছেন। জাভেদ আখতার আস্তে আস্তে সঙ্গীত জগতে অধিক সাফল্য পেয়েছেন। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত রচয়িতা হিসেবে অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। সেলিম খান পরে বিয়ে করেছেন শোলের 'মেহবুবা ও মেহবুবা' নাচের হেলেনকে, এবং অবসর নিয়েছেন। তাদের তিন ছেলে নায়ক সালমান, আরবাজ এবং পরিচালক সোহেল আলোকবর্তিকা বহন করে চলেছে।

অমিতাভ বচ্চন বিগত দুই যুগেরও অধিককাল ধরে সুপারস্টার অবস্থান ধরে রেখেছেন। তার ধারেকাছেও কেউ নেই। একাই তিনি প্রতিষ্ঠিত। জয়া বচ্চন শোলের পর সংসার নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকলেও ১৯৮১ সালে 'সিলসিলা' ছবির মধ্য দিয়ে দারুণভাবে ইন্ডাস্ট্রিতে ফিরে আসেন। এরপর মাঝেমধ্যে করেছেন ব্যতিক্রমী চরিত্র।

ধর্মেন্দ্র-হেমা মালিনীর বিয়ে হয় আশিতে। ধর্মেন্দ্রর দ্বিতীয় স্ত্রী হলেও ড্রিমগার্ল হিসেবে তার ইমেজ এতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এই দম্পতির দুটি কন্যাসন্তান।

সঞ্জীব কুমার বাণিজ্যিক নায়ক হিসেবে নয়, প্রতিভা পেয়েছেন উত্তম চরিত্রাভিনেতা হিসেবে এবং পেয়েছেন অজস্র পুরস্কার। মাত্র ৪৭ বছর বয়সে মারা যান হরি ভাই জীবন যাপনে অতিরিক্ত বেহিসেবিপনার কারণেই।

আমজাদ খান মারা যান বিরানব্বুইয়ের ২৭ জুলাই। পঞ্চাশে পা দিতে তখনো তার দু'বছর বাকি। দেশের শীর্ষ খলনায়ক এবং একজন ভালো চরিত্রাভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান আমজাদ। মুকাদ্‌দার কা সিকান্দার, সোহাগ, নটবরলাল- তার অভিনীত ছবিগুলো হিট হয়।

ছিয়াত্তরের ১৫ অক্টোবর আমজাদ খান সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হন। তার গাড়ি ধাক্কা খায় গাছের সঙ্গে, স্টিয়ারিং আঘাত করে তার পাঁজরে। জটিল অবস্থা থেকে জীবন ফিরে পান তিনি। কিন্তু অতিরিক্ত ওষুধ সেবনে তিনি অতিরিক্ত স্থূলকায় হয়ে যেতে থাকলে তার কাছে কমেডিয়ানের রোল করার অফার আসতে থাকে। তাতে তিনি মোটেই বিচলিত হতেন না, আমৃত্যু তিনি বলে গেছেন যে ছিয়াত্তর সালেই তার মৃত্যু হতে পারতো, তিনি বেঁচে আছেন বোনাস আয়ু নিয়ে।

জগদীপ করেছিলেন সুরমা ভোপালীর চরিত্র। সত্যি সত্যি একজন সুরমা ভোপালী এসে উপস্থিত হয় তার শুটিং স্পটে। জগদীপের তো আর তাকে চেনার কথা নয়। বাস্তবের সুরমা ভোপালী তাকে অনুযোগ করে বলে যে, তার চরিত্রটি সমাজে তাকে বিড়ম্বনায় ফেলেছে। জগদীপ ওই লোকটিকে এড়াতে সক্ষম হলেও এড়াতে পারেননি শোলের চরিত্রটিকে। ১৯৮৮ সালে তিনি 'সুরমা ভোপালী' নামে একটি সিনেমা বানান।

'আংরেজিওকে জামানে কে জেলার' (ইংরেজ আমলের জেলার)- এই অভিধা ট্রেডমার্ক হয়ে দাঁড়ায় আসরানির ক্ষেত্রে। নিউইয়র্ক থেকে লুধিয়ানা পর্যন্ত হাজারো নাটকে তিনি হিটলারের প্যারোডি চরিত্রে অভিনয় করেন। জেলারের চরিত্রটি এতোটাই জনপ্রিয় ছিল যে তাকে সব সময় একটি ড্রেস এবং পরচুলা রেডি রাখতে হতো অভিনয় করার জন্যে।

বিজু খোটে চিরটা কালের জন্য কালিয়া হয়ে ওঠেন। যেখানেই যান তাকে শুনতে হয় কালিয়া সম্বোধন। এতে তার শিশুপুত্র খুবই বিরক্ত হতে থাকে। বিজু তাকে এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে এই কালিয়ার কারণেই তারা দু বেলা খেতে পারছেন।

ম্যাক মোহনেরও অনুরূপ অবস্থা। তার আত্মপরিচয় হারিয়ে গেছে। লোকে তাকে সাম্বা বলেই ডাকে। অটোগ্রাফ দেবার সময় নিজের নাম 'ম্যাকমোহন' লিখলে তারা আপত্তি জানায় এবং সাম্বার স্বাক্ষর দেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে।

আটাত্তরের ৫ জানুয়ারি মারা যান শোলের প্রধান ক্যামেরাশিল্পী দোয়ার্কা দিবেকা। তার বয়স হয়েছিল ষাট। মৃত্যুর আগের সারা রাত ড্রিঙ্ক করেছিলেন। নাতনির বয়সী একটা মেয়ের সঙ্গে তার এফেয়ার নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে স্ক্যান্ডাল হয়। একবার এক শুটিং স্পটে দিবেকা সহকর্মীর কাছে জানতে চান যে তাকে জড়িয়ে কোনো অপপ্রচার তিনি শুনেছেন কি না। 'না' বাচক উত্তর পেলে তিনি নিজেই মন্তব্য করেন যে- 'আমি শুধু একটি সন্তান চাই।'

শচীন হয়ে ওঠেন একজন পরিচালক। শোলেতে কাজ করার জন্য কোনো সম্মানী গ্রহণে তিনি অস্বীকৃতি জানালে রমেশ তাকে একটি এয়ারকুলার উপহার দেন। শচীন মজা করে বলেন যে, যখন এসির ঠান্ডা বাতাস আমার শরীরে এসে লাগে তখন আমার শোলের কথা মনে পড়ে।' দু'দশক পর শচীন টিভি প্রোগ্রামের জন্য শোলের একটি প্যারোডি নির্মাণ করেন।

শোলের স্মারক আক্ষরিকভাবেই রয়েছে শোলে টিমের সবারই গৃহে। আর 'শোলে' নিজে হয়ে উঠেছে মিথ। শোলের সঙ্গে অমরত্ব লাভ করেছে গাব্বার সিং, কিংবা একজন আমজাদ খান এবং আরো কেউ কেউ। ■